

ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন, ১৩৫২ সাল

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

শ্রীপশুপতি দে

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী : রবীন দত্ত

তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহের এই লেখাটি আনন্দবাজার পত্রিকায় (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে, ইংরেজীতে) ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল। ভারতের সর্বপ্রান্তে এবং দিল্লীর পার্লামেণ্টে এই থেকে বিপুল আলোড়ন জাগল। দাবি উঠেছে, কোন এক প্রধান-বিচারকের নেতৃত্বে নেতাজী সম্পর্কে নূতন করে অনুসন্ধানের জন্য।

ফরমোসা, রাশিয়া এবং অপর বহু জায়গায় লেখক নিজে ঘুরে ঘুরে নানা তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। প্রচার হয়েছিল, ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে (জাপানীদের আত্মসমর্পণের দুই দিন পরে) ফরমোসা দ্বীপের তাইপে ঘাঁটিতে নেতাজী প্রাণ হারিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ অলীক—ঐ তারিখে তাইপেতে কোন বিমান-দুর্ঘটনা হয়নি। দশ মাস আগে ১৯৪৪ সনের ২৩শে অক্টোবর তাইপেতে বিমান-দুর্ঘটনা হয়। জাপানী গোয়েন্দা-বিভাগ কর্নেল হবিবুর রহমানকে সেই ফোটোই সরবরাহ করেন। নেতাজীকে হত্যার আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নেতাজী গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

কয়েক বছর আগে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন নামক জায়গায় নেতাজী ছিলেন, তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। রুশ-সেনাদের হাতে বন্দী হয়ে তিনি কারাগারে ছিলেন, তারও সাক্ষ্য আছে।

এখনও কি তিনি নিভৃত বন্দীজীবন অতিবাহিত করছেন ?

তদন্ত করে তাঁর সঠিক অবস্থিতি নির্ণীত হোক। দেশবাসীর সামনে আবির্ভূত হয়ে মহানেতা আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

॥ ১ ॥

সাগরপাড়ির আগের কথা

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ফরমোজা দ্বীপের যে জায়গায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন বলে খবর বেরিয়েছিল, ঠিক সেইখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ১৯৬৪ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে।

১৯৪৫ সালের ২৪শে আগস্ট ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করে যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ফরমোজার তাইপে বিমানক্ষেত্রে এক দুর্ঘটনার ফলে নেতাজী আহত হন এবং একটি জাপানী হাসপাতালে তিনি মারা যান। এই সংবাদের সূত্র হল একটি জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। তদানীন্তন বৃটিশ ভারতীয় সরকার কর্তৃক সংবাদটি সমর্থিত হয়।

স্বাধীনতার পরে দিল্লীর কংগ্রেস সরকারও নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এই জাপানী সংবাদটিকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন। সংবাদটির সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী নেহরু জাপানে কয়েকটি তথ্যানুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। কিন্তু তাইপের অকুস্থলটি সম্পর্কে কোনও তদন্ত করা হয়নি।

নেতাজীর প্রশ্নে ভারত সরকারের এই একরোখা মনোভাব বাস্তববাদী যুক্তি অপেক্ষা অন্য কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত। নেতাজীর ভাগ্য সম্পর্কে যাঁরা ভাবপ্রবণ তাঁদের মনে যেমন সংশয় জেগেছে, তেমনি নিরপেক্ষগণও মনে করেন সরকারের এইরূপ মনোভাব যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ বিষয়ে সরকারী ভাষ্যের সংশোধন আবশ্যক।

জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই এর প্রয়োজন। আমার পূর্বে আমাদের কোনো দেশবাসীই তাইপেতে সংঘটিত এই রহস্যজনক দুর্ঘটনার মূল নথিপত্র সংগ্রহে যত্নপর হননি দেখে আমার বিস্ময় জাগে।

নেতাজী-প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকার ফলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় অলিখিত রয়েছে! চৈনিক বিভীষিকার মোকাবিলা করা ও দেশের ভবিষ্যৎ কাঠামো দৃঢ় করার অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য এর মীমাংসা প্রয়োজন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড এককভাবে সুভাষের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের সংবাদ ঘোষণা করে সারা দুনিয়ায় এক বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবার ১৯৪২ সালে রয়টার যখন সুভাষের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করে, তখন এই পত্রিকা দুটি কোনো শোকজ্ঞাপক স্তম্ভ প্রকাশ করেনি। কয়েক দিনের মধ্যেই এই মৃত্যু-সংবাদ অসত্য বলে জানা যায়।

এরূপভাবে ফরমোজায় অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ১৯৪২ সালে রয়টার পরিবেশিত সংবাদটি যেমন সত্য ছিল না, তেমনিই অসত্য ছিল ১৯৪৫ সালে জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশিত সমাচার।

আরও একবার একই কারণে আমরা কোন শোক জ্ঞাপন করিনি।

এখন আমার দৃশ্যপটের সম্মুখে রয়েছে ৩৬৭৩ ফুট উচ্চ য়ুয়ানশান পর্বতমালা। পাদদেশে কিলুং নদী ঘন বাঁকে প্রবাহিত। নদীর দক্ষিণ তীরে হল এক বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ফরমোজার রাজধানী তাইপের সেই সামরিক-অসামরিক বিমানক্ষেত্র।

কিলুং সেতুর শীর্ষে সারি সারি বিমান উড্ডীয়মান। অবতরণের সময় অথবা উপরে ওঠার মুখে বিমানগুলি গোলাকৃতি হয়ে ঘুরছে। পৃথিবীর যে কোন নিরাপদ বিমানক্ষেত্রের মত তাইপের বিমানক্ষেত্রের সম্মুখভাগ। তাইপের বিমানক্ষেত্রের ইতিহাসে বিমান-দুর্ঘটনার সংবাদ মাত্র একটি। সেই দুর্ঘটনার তারিখ হল ১৯৪৪

সালের ১৩শে অক্টোবর। ফরমোজার সংবাদে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্টে কোনো বিমান দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে বলে জানা যায়নি।

*　　　*　　　*　　　*

ফরমোজা দ্বীপে অবতরণ আমার কাছে একটি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যস্বরূপ। টোকিও অলিম্পিক দর্শনের জন্য আমার বিদেশী প্রকাশক বিমানপথের একটি টিকিট পাঠান। সেটি আমি কলকাতায় পেলাম—একমাস পরে।

দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্বল্প হলেও এর কয়েকটি অঞ্চলে কাজ করার সুযোগ আমার ঘটেছে।

অচিন দেশে পাড়ি দেবার মত অনাবিল আনন্দের আস্বাদ বাস্তবিকই অবর্ণনীয়।

টোকিও যাবার পথে আমার ফরমোজা দেখার সৌভাগ্য হল হংকং পৌঁছোবার পর। সি-এ-টির একজন বৈমানিক বন্ধু ফরমোজাগামী একটি মান্দারিন জেটে আরোহণে আমাকে প্রলুব্ধ করলেন। এখানে নেতাজী সম্পর্কে আমার সংশয় নিরসন করার সুযোগ এল। আমরা সেই অপরাহ্ণে হংকংয়ের স্থানীয় সময় ৩-১০ মিনিটে একটি কনভয়ার ৮৮০-এম জেটে আরোহণ করলাম। ইতিপূর্বেও আমি এই ধরনের জেট বিমানে ভ্রমণ করেছি। বিমান চালনা সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পেয়ে পাইলট আমাকে ককপিটে আহ্বান করলেন।

নয়নাভিরাম সুন্দর ফরমোজা দ্বীপের উপর একটি মেঘের আবরণ ক্রমশ আস্তীর্ণ হতে আমরা দেখলাম। ক্রমশ নিকটবর্তী হতে মনে হল একটি শ্বেতশুভ্র কম্বলের ফাঁকে পেস্কাডোর শ্রেণীভুক্ত ফরমোজা দ্বীপ যেন ইঙ্গিতে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী চীন এবং লাল চীনের সৈনিকদের মধ্যে কামানের গোলা বিনিময়ের কথা আমার স্মৃতিপথে জাগল। স্মৃতিপটে ভেসে উঠল সেই দৃপ্ত বাণী—'আমাকে হত্যা করার মত কোন বোমা আজও সৃষ্টি হয়নি।'

আমার বেশ ম[illegible] [illegible], এক[illegible]গুলি হল সুভাষবাবুর, আমাদের

প্রিয় নেতাজীর। যুদ্ধের পূর্বের দিনগুলিতে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মুহূর্তে তাঁর অবয়ব আমার নয়নপথে ভেসে উঠল। সম্বিৎ ফিরল বৈমানিকের আহ্বানে। তিনি আমাকে অঙ্গুলির নির্দেশে বললেন, "আমরা এখন তাইপে বিমানপোতের মুখে এসে পেঁাচেছি। এবারে আমরা অবতরণ করব।"

মুহূর্তে আমার মনে এলো—এই সেই স্থান—যেখানে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

* * * *

বৈমানিক বন্ধুটি তাঁর ছুটির পরে আমাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে তাইপে বিমানপোতের সম্মুখভাগ পরিষ্কার-ভাবে দেখলাম। হোটেলে পেঁাছে বন্ধুটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাইপেতে আমার কোনো পরিচিত জন আছেন কি না। জেনারেল পাও আমার পরিচিত, তাঁকে জানালাম। এঁর সঙ্গে বার্লিনে আমার পরিচয়। সেখানে আমরা উভয়েই স্ব স্ব দেশের কূটনীতিক সদস্য ছিলাম। হোটেলের তথ্য-সরবরাহকারী করণিক আমাকে বললেন, "জেনারেল পাও এখন তাইপের বৈদেশিক দপ্তরে নিযুক্ত। আমি তাঁকে এখনই ফোনে ডাকছি—আপনি কথা বলুন।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পূর্বেই জেনারেল পাও আমার হোটেলে এসে উপস্থিত হলেন। বার্লিনে আমাদের অবস্থানকালে আমরা প্রায়ই নেতাজী সম্পর্কে আলোচনা করতাম। সেই পুরানো আলোচনার সূত্র টেনে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, সেই বিমান দুর্ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া যেতে পারে কি?"

"আমরা আপনার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করব।"

"বিমান দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয় জাপানীরা অবশ্যই করে থাকবেন।"

"জাপানীরা কি কোনো তথ্যমূলক নথিপত্র এখানে রেখে গিয়েছে?"

"এটাও আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আপনি সত্য নিরূপণে যখন এত উৎসুক, আমাদের বিশেষজ্ঞ দলকে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করতে বলব। দূরে এক পর্বত গুহার মধ্যে আমরা হাজার হাজার টন জাপানী নথিপত্র সযত্নে রেখেছি। এগুলি দেখার পক্ষে আমার বাধা নেই। তবে নথিপত্র বের করে আনা যে সময়সাপেক্ষ তা আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন।"

"আপনার অনুসন্ধানের ফল আমি সাদরে নিয়ে যেতে চাই।"

"আপনার প্রস্তাব আমি সাদরে গ্রহণ করছি। আপনার কর্তব্যে আমরা যথাসাধ্য সহায়তা করব।" জানালেন জেনারেল পাও।

* * * *

জেনারেল পাও প্রেসিডেণ্ট জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইশেক এবং সমাজ রাজনীতি এবং সমরবিভাগীয় সর্বস্তরের নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর পূর্বনির্দিষ্ট সময়মত তিনি ফরমোজা দ্বীপে সংরক্ষিত জাপানীদের গোপন নথিপত্র, এমন কি গুপ্তচর সূত্রে প্রাপ্ত অতি গোপনীয় দলিল দস্তাবেজ আমার সামনে পেশ করলেন। যে কোনো দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, এমন কি, প্রয়োজনবোধে ফটো নেবার অধিকারও আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

অচিরেই আমার কল্পনা সার্থক হল। আমার সামনে উপস্থিত হল সেই তাইপে বর্ণিত নেতাজী-রহস্যের পশ্চাতে সুদূরপ্রসারী ঘটনাবলীর তথ্যমূলক চিত্র।

॥ ২ ॥

নেতাজী সম্পর্কে নূতন আলো

ফরমোজা সরকার তাঁদের ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বাছাই করা পদস্থ কর্মচারীকে আমার অনুসন্ধান কার্যে সাহচর্য করার নির্দেশ দিলেন। বিশেষ করে, তাঁদের দুজন সর্বশ্রী চুয়াং এবং তাও আমার ঘনিষ্ঠ সহচর হয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই ফরমোজা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—শ্রীচুয়াং হলেন বৈদেশিক দপ্তরের এবং শ্রীতাও সাংস্কৃতিক সংস্থার।

শ্রীচুয়াং জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইশেকের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি ছিলেন নয়াদিল্লীতে চীন সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি। তদানীন্তন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। অবশ্য তাঁর আসল কাজ ছিল সামরিক এবং অসামরিক বৃটিশ ও চীনা গুপ্ত তথ্য সংগ্রহকারী বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।

তিনি আমাকে তাইপের গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিয়ে গেলেন। হোটেলের মধ্যে টেনিস প্রাঙ্গণে গিয়ে তিনি আমাকে স্থানটি দেখিয়ে বললেন, "এই সেই বিমান দুর্ঘটনার স্থান। তাইপের ইতিহাসে এটাই একক।"

"দুর্ঘটনার তারিখ?"

"১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর। টোকিও সময় অপরাহ্ন ২টা।"

"জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে তারিখটা কি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বলা হয়নি?"

"খবরটা সঠিক নয়। আমি আপনাকে যে সংবাদ দিলাম সেটি ছাড়া তাইপেতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয় নি।"

"আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কী করে?"

"আমি তখন নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত। জাপানী সূত্রের সংবাদে জানা যায় যে, ঐদিন ক্যান্টন থেকে তাদের সর্বশেষ বিমানটি ভারতীয় নেতা সুভাষ বসুকে নিয়ে যাত্রার পথে এখানে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তাঁর সঙ্গে তিনি প্রচুর সোনা এবং মণিমুক্তো নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

"আপনি তারিখটা সম্পর্কে কি সুনিশ্চিত ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর? ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নয়?"

"বিলকুল। আমি বিশ্বস্তসূত্র থেকে পাওয়া সংবাদের সঙ্গে পরখ করে দেখেছি।"

"যথা?"

"যুদ্ধের সময় জাপানীদের বিপক্ষে আমরা বৃটিশদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছি। জাপানী অধিকৃত চীনা-এলাকায় যাবতীয় গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত ছিল। এমন একটা কাজের সুফল পাবার জন্য জাপানী বাহিনীর মধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত লোকেরা অনুপ্রবেশ করে। এমন একজন লোক জাপানী গুপ্ত তথ্য বিভাগে কাজ নেয়। এই লোকটিই তাইপের বিমান দুর্ঘটনা অনুসন্ধানের কাজে জাপানীদের সাহায্য করে। সে এখন এখানেই আছে। আমাদের কাজে নিযুক্ত। আপনাকে এই দুর্ঘটনার স্থানে নিয়ে আসার আগে আমি তার সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলাপ করেছি। সে সুনিশ্চিত যে নয়াদিল্লীতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের কাছে বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ সে জানিয়েছিল, তা ছাড়া আর কোনো ঘটনা এখানে ঘটে নি। জাপানী দখলের সময় সে সর্বদাই তাইপেতে নিযুক্ত ছিল—এমন কি আমাদের পুর্নদখলের পরেও।"

"বিমান দুর্ঘটনার সঠিক বিবরণের কতটা আপনি জানেন?"

"জাপানী সূত্রে তখন বলা হয়েছিল যে সুভাষ বসুর পক্ষে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অনুচিত

হয়েছে। তাইপেতে তখন এক দুর্ধর্ষ জাপানী দস্যুদলের ঘাঁটি ছিল। তারা সুভাষ বসুর এই সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই দস্যুদল কোনোভাবে এই বিমান পৌঁছানোর সংবাদ সংগ্রহ করে। বিমানটি অবতরণের পূর্বে সংকেতে সংবাদ দেবার জন্য বিমানের চালকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।"

"আপনার মতে সুভাষ বসুর এই সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হয়?"

"নিশ্চয়ই। এই স্থানটিতেই জাপানীরা একটা নতুন মন্দির স্থাপন করেছিল। ১৯৪৪ সালের ২৫শে অক্টোবর সাড়ম্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার কথা ছিল। কিন্তু তার দু'দিন আগে সেই বিমানটি দস্যুদলকে সোনাদানা পৌঁছানোর সংবাদ সংকেতে জানাবার জন্য মন্দিরের উপরে ঘোরার সময় চূড়ার গায়ে ঘর্ষণ লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই বিমানে আগুন লাগে। তারপরেই দুর্ঘটনা। মন্দিরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিমান যাত্রীদের কেউ-ই বাঁচতে পারেননি।"

"এ খবর কি আপনি নয়াদিল্লীতে পান?"

"হ্যাঁ। এই খবরের বিবরণ পরে আমি বৃটিশ গুপ্ত তথ্য দপ্তরের খবরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।"

"কিন্তু এই বিবরণ আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না।"

"সেন্সর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সময়ে এই সংবাদ প্রচারের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তার কারণ, তাঁরা ভেবেছিলেন এর ফলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের গতি তাঁদের অনুকূলে যাবার সম্ভাবনা ছিল।"

"বেশ কৌতূহলকর সংবাদ তো। যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটল ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে এবং যাতে সুভাষবাবু বাস্তবিকই জড়িত ছিলেন না সেই সংবাদ যুদ্ধের শেষে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে প্রচার করা হল যে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন পুরোধার মহাপ্রয়াণ এভাবে ঘটেছে।"

চুয়াং আমাকে হোস্টেলের খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি বলে চললেন, "সুভাষবাবু সম্পর্কে বৃটিশ গুপ্ত তথ্য বিভাগে সুনিশ্চিত-ভাবে কোনো সংবাদ রয়েছে। সেটা তারা প্রকাশ করতে এখনও গররাজী। এই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই তারা জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মারফত দশমাস আগে যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটাই প্রচার করে। উদ্দেশ্য—ভারতীয় গণচিত্তে তাদের মহান নেতার ভাগ্য সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা।"

"আপনার বিবরণ বৃটিশ গুপ্ত তথ্য উদ্ঘাটনের পক্ষে আমাদের সহায়তা করবে।"

"সম্ভবত তাই হবে। আমার নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ করবেন, আপত্তি নেই। রহস্য উদ্ঘাটনে আপনার আগ্রহে আমাদের সরকার কি করেছেন যে, এই বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমাদের কাছে যে বিবরণ তা যথা শীঘ্র প্রকাশ করবেন।"

* * *

রুমালের জন্য জামা হাতড়াতে পকেট থেকে এক টুকরা সংবাদপত্র বেরিয়ে এল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্ককে পাড়ি দেবার পথে এটিকে আধ-পড়াভাবে রেখেছিলাম। পত্রলেখক হলেন শ্রীহায়াম্পিদ; একজন জাপানী ভদ্রলোক। কতিপয় ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকের উদ্দেশ্যে এটি লেখা। চিঠির তারিখ হল ১৯৬৪ সালের ২৮শে অক্টোবর। পত্রটি ১৯৪৫ সালের নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে প্রচারিত বিবরণের পুনরাবৃত্তি।

ফরমোজার অনুসন্ধানকারী সহযোগী শ্রীতাওয়ের হাতে সংবাদ-পত্রের এই টুকরাটি তুলে দিতে তিনি মন্তব্য করলেন, "জাপানীরা যে তাদের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৫-এর বিবরণটি এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯৪৪-এর তাইপে-দুর্ঘটনার সত্য তথ্য একবার ফাঁস হবার অর্থ হল শুধু যে বৃটিশ এবং ভারতীয় গুপ্ত তথ্য বিভাগের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ

জানানো তা নয়, এতে জাপানীদের মর্যাদা জড়ানো। যুদ্ধের সময় সুভাষ বসুর সঙ্গে দূরপ্রাচ্যে কি নোংরা চালাকি খেলা হয়েছিল সব এর ফলে ফাঁস হয়ে পড়বে।”

“ভারতে এই নোংরামি আমাদের জানা নেই।”

“সম্ভবত এর কারণ হল ফরমোজা ও ভারতের মধ্যে সরকারী বা ব্যক্তিগত স্তরে কোনো যোগযোগ না থাকা।”

“আপনাদের কাছে ভারত সরকার এ বিষয়ে কোনো তথ্য চান নি?”

“না। সুভাষ বসুর ভাগ্য সম্পর্কে আপনিই প্রথম ভারতীয় আমাদের কাছে সঠিক বিবরণ চাইলেন। বহু-ভাগ্য উদ্ঘাটনে যদি অনুসন্ধান চালিয়ে যান তাহলে দূরপ্রাচ্যে তাঁর প্রতি কি নোংরা আচরণ করা হয়েছে সবই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।”

শ্রীতাওয়ের মন্তব্যে নেতাজী সম্পর্কে দেশে যত লেখা পড়েছি সে সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা সৃষ্টি হল। যেসব পুস্তিকা সরকারী গুপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে বলে দাবী করা হয় সেগুলি আসলে দূরপ্রাচ্যে নেতাজীর মহান কার্য-কলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বতঃই মনে হবে।

য়ুয়ানশান পর্বতমালার ছায়াপটে সেই বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখিত স্থানটিতে আমি নেতাজীর সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধানের সূত্র আবিষ্কারে একটা নতুন আলো দেখতে পেলাম।

॥ ৩ ॥

সাইগন থেকে নেতাজী কোথায় গেলেন ?

তদানীন্তন জাপ সরকারের পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র সুবিন্যস্ত ছিল না। ফরমোজান বন্ধুরা যখন সেই স্তূপ থেকে গোপন তথ্য অনুসন্ধানে রত, আমি আপন.পথে অন্য সূত্র উদ্ভাবনে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রেসিডেণ্ট হোটেল তাইপের মধ্যে সর্ববৃহত্তম। হোটেলের দশম-তলার জানালা দিয়ে আমি বিমানগুলির গতিবিধি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করলাম। দেখলাম—য়ুয়ানশান পাদদেশে যেখানে সেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার উপর বা আশপাশ দিয়ে সচরাচর কোন বিমানের উড়ে যাবার দরকার হয় না। ১৯৪৪-এর দুর্ঘটনার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, বিমান চালকের ইচ্ছা ছিল চীনা ও জাপানীদের মিলিত ষড়যন্ত্রকারীদের সংকেত জানানো। আর সেই সময়েই বিমানটি জাপানীদের তৈরী নতুন মন্দিরের চূড়ায় ধাক্কা খায়।

আমার মনে পড়ল ১৯৪৫-এর দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যা ছাপা হয়েছিল তা বেশ নতুন ধরনের। বলা হয় যে, উড্ডীয়নের পরেই বিমানের প্রপেলরের সঙ্গে কোনও পাখির সংঘর্ষ লেগে থাকতে পারে। তার ফলে মাত্র ৩০০ ফিট উঁচু থেকে বিমানটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায়। বিমানে আগুন লাগে। যাত্রীদের সাতজন বেঁচে যান। কিন্তু নেতাজীর মাথায় আঘাত লাগে এবং ছ ঘণ্টা বাদে তিনি মারা যান।

দুর্ঘটনার বিবরণ পরখ করে দেখার জন্য তাইপে থেকে সওয়া এক মাইল দূরে সুংশান বিমানক্ষেত্রে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমাকে জানালেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক বিমানপোতাশ্রয়টি ১৯৪৫ সালে সামরিক বিমানক্ষেত্র ছিল। তখন এর রানওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৫০০০ ফিট। উড্ডয়ন বা অবতরণ হত ন' ডিগ্রী কোণ থেকে।

পর্বতের পিছনে যে দিক থেকে বিমানটি উঠেছিল সেদিকে কোন প্রকারেই ধাক্কা খেতে পারে না, তা উপলব্ধি করার মত এই বিবরণটুকুই যথেষ্ট। বেশ কয়েক মাইল দূরেই সামনের পর্বতমালা। কোন বিমানই পশ্চাৎমুখী যায় না।

বর্তমান বিমানঘাঁটির কোন কর্মীই তাইপের দুর্ঘটনার কিছু জানেন না। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমাকে বললেন, লুয়াংশান মন্দিরে গেলে বিমানপোতের কয়েকজন প্রাক্তন কর্মীর সাক্ষাৎ পেতে পারি। তাঁরা তথায় অবসর জীবন যাপন করছেন।

তাইপের মধ্যেই লুয়াংশান মন্দির। অভ্যন্তরে সোনা দিয়ে মোড়া সব প্রতিমা এবং পাথরের থামগুলি খোদাই করা। ২৩০ বছরের এই পুরানো বুদ্ধ মন্দির আলঙ্কারিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। কুয়ান-ইন দেবীকে চীনারা করুণার অধিষ্ঠাত্রী বলে। এই বহু-পূজিতা দেবী প্রতিমার সামনে দেখলাম একজন বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানাচ্ছেন।

প্রণিপাত শেষে তিনি চলে যাবার উপক্রম করছেন দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, "তিনি তাইপে বিমানপোতের একজন প্রবীণ কর্মী কিনা?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধের সারা সময়টাই আমি জাপানীদের অধীনে বিমান-পোতের ফায়ার ব্রিগেড বাহিনীর কর্মী ছিলাম।"

"আপনার সময়ে কোনও দুর্ঘটনার কথা কি মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ, ১৯৪৪-এর অক্টোবরে একটি হয়েছিল। কিন্তু সেই সোনাবাহী বিমানটি লুঠ করার জন্যই জাপানী ষড়যন্ত্রকারীর দল ভূপাতিত করে। সে দিনটি আমাদের খুব কষ্টে কেটেছে। ঐ য়ুয়ানশান পাহাড়ে জাপানীদের তৈরী নতুন মন্দিরটি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত শত লোককে জঞ্জাল সাফ এবং সোনা খুঁজে বের করে জাপানীদের দেবার কাজে লাগানো হয়। ঐ দুর্ঘটনার বহু প্রত্যক্ষদর্শী ফরমোজার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বাস করছেন।

তাঁদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হতেও পারে। আপনি যদি অনুসন্ধান চালিয়ে যান তাহলে এই তাইপেতেই আপনি কমপক্ষে কয়েক ডজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাবেন।"

"১৯৪৫-এর আগস্টে কি আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল?"

"১৯৪৫-এ কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিনি। কিছু হলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। কারণ আমি দমকলবাহিনীর লোক। দুর্ঘটনার স্থানে ছুটে যাওয়াই আমাদের কাজ।"

কুয়ান-ইন দেবী প্রতিমা ছাড়া, মন্দিরে আছেন সমুদ্র দেবী, মাৎসু। আর একজন ভক্ত মাৎসু দেবীর সম্মুখে প্রার্থনা করছিলেন। দমকল কর্মী বন্ধু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, "ইনি আমার বন্ধু য়ু। যুদ্ধের সময় বিমানে তেল ভর্তি করা এঁর কাজ ছিল। সম্ভবত ইনি আপনাকে আরও কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।"

১৯৪৪-এর একটি ছাড়া আর কোনও দুর্ঘটনার কথা য়ুর মনে পড়ল না। যা হোক, তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "১৯৪৫-এর সেই বিমানটি কোথা থেকে আসছিল?"

"তাদের খবর—সাইগন থেকে ১৮ই আগস্ট রওনা হয়।"

"আর তাইপেতে কখন সেটি দুর্ঘটনায় পড়ে?"

"তাঁরা বলেন—সেইদিনেই, টোকিও সময় বেলা ২টায়।"

"তখনকার দিনে না থেমে সাইগন থেকে তাইপেতে কোনও যাত্রী বিমান পাড়ি দিল, আর এত শীগগিরই পৌঁছল—এ যেন কেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

"সচরাচর ঐ পথে তাইপেতে বিমানগুলি কি করে আসত?"

"বেশীর ভাগই ক্যাণ্টনে তেল নিত।"

"সাইগন তাইপের মাঝে বিমানটি আর কোথাও নামার সংবাদ তারা জানায়নি।"

"ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! কিন্তু বিমানটির ব্যাপারে আপনার এত খোঁজের আসল কারণ কি?"

"আমাদের মহান নেতা বসু তাইপের সেই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে প্রকাশ।"

"আমার যতদূর মনে পড়ে আপনাদের বসু ১৯৪৪-এর অক্টোবরের দুর্ঘটনায় নিহত হন।"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"যে জাপানীরা তাঁর সোনা লুঠ করেছে তারাই প্রকাশ্যে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়েছে।"

ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলাম।

১৯৪৪-এর দুর্ঘটনায় নেতাজী যে নিহত হননি শুনে আমার মন্দিরবাসী বন্ধুদ্বয় খুব খুশী হলেন। তাঁদের বললাম, "১৯৪৫-এর আগস্ট পর্যন্ত দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতেও তিনি জীবিত সুস্থ এবং সবল ছিলেন তার সপ্রমাণ তাঁর বহু ছবি, চিঠি এবং রেডিওবাণী প্রচারের টেপ রেকর্ডস ভারতে রয়েছে।"

পূর্ব ব্যবস্থামত শ্রীতাও মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর কাছে কয়েকটি দরকারী সংবাদও পেলাম।

তিনি বললেন, "যুদ্ধকালীন আমাদের নয়াদিল্লীর কূটনৈতিক ও সামরিক মিশনের কাগজপত্র দেখলাম। এটা সন্দেহের অতীত যে, বৃটিশ গোয়েন্দাদল সুভাষ বসুর পশ্চাৎ অনুসরণ করছিল। টোকিও থেকে যে বিমানে শ্রীবসুর আসার কথা ছিল সেটিকে তাইপেতে নামাবার জন্য বৃটিশ অর্থে একদল ষড়যন্ত্রকারী মোতায়েন থাকে। ভ্রমণসূচীর কিছু পরিবর্তনের ফলে শ্রীবসুর যাত্রাসময় পিছিয়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সংগ্রহ করা সোনা বোঝাই বিমানটি টোকিও পাড়ি দেবার পথে জাপ বাহিনী তাইপেতে ভূপাতিত করে। আমাদের অনুচরদের অনুমান, শ্রীবসু ঐ বিমানে ছিলেন। আর সেই

মত আমাদের কাগজপত্রে তাঁকে ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর নিহত ঘোষণা করা হয়।"

"নয়াদিল্লির পক্ষে সংবাদটি নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক।"

"বিলক্ষণ। বসু ছিলেন তাদের প্রধান শত্রু। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত বৃটিশ গোয়েন্দাদল তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে।"

"খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট বিমানে সাইগন ত্যাগের পর তাঁর কি হল, সে সম্পর্কে খবর নেওয়া।"

"যা হোক, এটুকু আমরা নিঃসন্দেহ যে সেদিন এখানে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং তাইপেতে শ্রীবসুর মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। সুপ্রসন্ন ভাগ্য যে তিনি ১৯৪৪-এর দুর্ঘটনায় পড়েননি। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এটিকেই ১৯৪৫-এর আগস্টে প্রচার করল।"

"এমন প্রচারে কি প্রয়োজন ছিল?"

"তাদের অপরাধ গোপন করা।"

এই অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।"

শ্রীতাও বললেন, "একবার শ্রীবসু সম্পর্কে আমাদের নথিপত্র প্রকাশ করলে নয়াদিল্লিতেও একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হবে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, বাস্তবে যিনি মরণকে পরাজিত করেছেন তাঁর সম্পর্কে সত্য আমাদের উদ্ঘাটন করতে হবেই।"

॥ ৪ ॥

নেতাজীর রণ-চেতনা

আমাদের যুগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত কোন ভারতীয় নেতা সুনিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করেননি। বৃটিশ শাসনের শেষ বছরগুলিতে শাসকরা স্বাধীনতালাভে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় গণচেতনাকে প্রায় কণ্ঠরোধ করে এনেছিল। ভারতীয় গণমানস আত্মবিকাশের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির শীর্ষসময়ে রুখে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র। সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যের বুকে শেল হানলেন। দৈত্যের পতন হল। কিন্তু সে আত্মতুষ্টি লাভ করল যে, সুভাষও তার সঙ্গে গতাসু।

ভারতে বৃটিশ রাজের অবসান দিবালোকের মত স্পষ্ট। কিন্তু নেতাজীর আত্মা দূরের কথা, তাঁর মৃত্যুর কোন প্রমাণ নেই। তাঁর আত্মা অবিনশ্বর।

সূর্যালোকের প্রথম ঝলকে উদ্ভাসিত য়ুয়ানশান শীর্ষ। একটি সি-৪৭ শ্রেণীর বিমানে আরোহণ করলাম প্রত্যক্ষ করতে—কি পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে শেষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

* * * *

আমাদের বিমান চালক ছিলেন কর্ণেল ইয়ে। তাঁর পাশের আসনটিতে আমাকে বসালেন। কিনমেন দ্বীপপুঞ্জের দিকে বিমানের গতিপথ স্থির করে আমরা কথাবার্তা শুরু করলাম।

"জাপানীদের হাত থেকে বিমানঘাঁটি নেবার সময় আমি প্রথম বৈমানিকদলে ছিলাম।"

"কিনমেন দ্বীপ তখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ?"

"না, এমন বিশেষ কিছু নয়। একাজ নেবার আগে নয়াদিল্লিতে

আমি মিলিটারী এ্যাটাসে ছিলাম। বৃটিশদের ভারত ছাড়ার সময় আপনারা যেমন দুর্ভোগে পড়েছিলেন জাপানীদের কিনমেন ছাড়ার সময় আমাদেরও ঠিক তাই হয়েছিল।"

"আপনার পদাধিকারবলে এশীয় গণজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দিকটি সম্পর্কে আমাদের চেয়ে আপনি বিশেষ ওয়াকিবহাল।"

"নয়াদিল্লিতে থাকার সময় আমি দেখেছি যে, আপনারা জাতীয় জীবনে সামরিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেন না। বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হতে পারে—এমন চিন্তার ছোঁয়া-ঘেঁষাকে আপনাদের নেতারা প্রকাশ্যে ঘৃণা করেছেন।"

"সত্যিই তাই।"

"আমার বেশ মনে পড়ে বৃটিশদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করার জন্য অস্ত্র ধারণের কথা যদি কেউ বলে থাকেন, তিনি হলেন আপনাদের একমাত্র নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। আর তার জন্য তাঁকে কি মূল্য-ই না দিতে হয়েছে!"

"এ সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ আপনার কিছু জানা আছে?"

"নিশ্চয়ই, আমি জানি। আমাদের চুংকিং সরকারকে তাঁর সম্পর্কে খবর দেওয়া আমার কাজ ছিল। জাপানের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে সামরিক গতিবিধি ও বিজয়ের পরিকল্পনায় আমরা যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। সুভাষ বসু ছিলেন আমাদের প্রধান অন্তরায়। তাঁর শক্তি ছিল আমাদের দশ পনের ডিভিশন সৈন্যবাহনীর সমতুল। তিনি আমাদের শত্রু ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। কারণ তিনিই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়দের মধ্যে অন্যতম অবিসম্বাদী সমর-নায়ক।"

"তাঁর চরিত্রের কোন্ দিকটি আপনাকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল?"

"যুদ্ধ-চেতনায় তাঁর মহান অবদান।"

"সে আবার কি?"

"সমর-বিজ্ঞানে যাকে বলে 'সামগ্রিক রণ-চেতনা' সৃষ্টির অনুকূলে গণমানসকে জাগ্রত করা। আত্মসমর্পণের চিন্তা কোন দিনই সুভাষ বসুর মনে জাগেনি। তাঁর আদর্শে যুদ্ধ হল 'জাতীয় যুদ্ধ—শেষ বিজয়ে।' সে যত দীর্ঘ হোক বা তাঁর জন্য যত মূল্য দিতে হোক না কেন—শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কম্যুনিস্ট দস্যুদের কবল থেকে আমাদের মূলভূমির মুক্তির জন্য আমরা এই ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তারা আমাদের সঙ্গীদের নির্দয়ভাবে খুন করছে। তবুও আমরা নিরস্ত হইনি।"

"বসুর যুদ্ধ-চেতনার বৈশিষ্ট্য কি?"

"তাঁর লক্ষ্য হল জাতীয় বিজয়। তাঁর আদর্শে জাতীয় বিজয়ের জন্য সমগ্র জাতি—জাতির রাজনীতি এবং কূটনৈতিক কৌশল সব কিছুর সমন্বয়ে যুদ্ধ-প্রস্তুতি হবে। গণচেতনার একমাত্র লক্ষ্য হবে যুদ্ধ জয়। এমন একটি যুদ্ধে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সত্তা এককে রূপান্তরিত হবে। যুদ্ধ শেষ হবে শেষ বিজয়ে—যখন ভারত, চীন, জাপান এবং পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"অতি উত্তম।"

"আত্মসমর্পণও নেই, নেই পরাজয়। এই আদর্শেই বসুর সঙ্গে সংঘাত লাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানী সমরনায়কদের। বসুর চিন্তায় আত্মসমর্পণের প্রশ্ন জাগেনি। আমরা যতদূর জানি তিনি আত্মসমর্পণ করেননি।"

"শেষ অবধি তাঁর কি হল?"

"এর উত্তরের জন্য আপনাকে বৃটিশ, জাপানী এবং জাতীয় চীন সরকারের গোপন নথিপত্র ঘাঁটতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাকে আমরা সহায়তা করছি, প্রতিশ্রুতি মত আমাদের সরকার এবিষয়ে তাঁদের নথিপত্র প্রকাশ করলে আমরা একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ করব।"

* * * *

আমাদের দৃষ্টিপথে এল কিনমেন দ্বীপ আর একটা কালো ছায়ার আকারে চীনের মূলভূমি। এই দিকে স্মিতহাস্যের সঙ্গে কর্ণেল অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এই সেই স্থান যেখানে আমরা সুভাষ বসুর যুদ্ধ-চেতনার আদর্শকে কাজে লাগিয়েছি।"

"কেমন করে?"

"আমি অপনাকে আগেই বলেছি 'বর্বর চিকুম' (চীনা কম্যুনিস্ট) বাহিনীর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করিনি বা কখনও করব এমন চিন্তা আমাদের আসেনি। এই দ্বীপের গণমাসে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি অমিত তেজ রয়েছে তার কিছুই আপনারা ভারতে জানেন না। এখানে আমাদের জনসংখ্যা মাত্র এক কোটি কুড়ি লাখ। চিকুমরা বড়াই করে যে, তারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য মূলভূমির সত্তর কোটি লোকের শক্তিকে প্ররোচিত করেছে। তাদের সাতশোর সামনে আমরা বারো জন। তবু চিকুমদের চরম শাসানি সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীন সত্তাকে এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছি।"

"আপনারা বীর।"

"১৯৬২-র শরতে আপনারা হিমালয়ের একটি মাত্র যুদ্ধে চিকুমদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু আপনাদের হৃত ভূমির পুনরুদ্ধারের জন্য কোন প্রতি-অভিযান শুরু করেননি। আপনাদের বিশাল দেশের তুলনায় আমাদের এই দ্বীপ এবং জনসংখ্যা নগণ্য। তবুও আমরা যথাসময়ে প্রতি-আক্রমণের জন্য তৈরী রয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনারা সুভাষ বসুকে ভুলে গেলেন। আর আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে 'সামগ্রিক যুদ্ধে' নেমেছি।"

কিনমেন দ্বীপে আমাদের অবতরণের পর নেতাজীর পদচ্ছায়ায় এক বিচিত্র উপলব্ধি করলাম। কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী চীন আজ নেতাজীর মাতৃভূমি ভারতের উপর আগ্রাসী থাবা মেরে বসে আছে, কালের অমোঘ বিধানে তারই ধ্বংসের জন্য ভাবী ঐতিহাসিক-বাহিনীর বিস্ময়কর পটভূমি এই স্থান—এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

কম্যুনিস্ট আগ্রাসী অভিযান প্রতিহত করার সংগ্রামে নেতাজীর রণচেতনা এবং তাঁর দুর্জয় সাহসকে আমাদের সম্মুখে রাখার প্রয়াস করা কর্তব্য। এটা নিঃসন্দেহ, তবেই কোন অনুশোচনা বা ভীতি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই আদর্শেই আমরা মৃত্যুকে হার মানাবো—যেমন শেষ বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে করেছিলেন নেতাজী। তাঁর যুদ্ধ-চেতনা অনুসরণেই আমরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হব।

॥ ৫ ॥

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বেলা আড়াইটা

ফরমোজা দ্বীপে নেতাজী সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান অনির্দিষ্ট-কালের জন্য দীর্ঘ হয়ে উঠল। তাইপেতে নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার দিনক্ষণ, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্টের বিকেলের পর থেকে তাঁর গতিবিধির একটা সূত্র বের করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অচিরেই আমি এমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেলাম যার থেকে জানা যায় যে নেতাজীর গতিবিধি গোপন রাখার জন্যে জাপানী গোয়েন্দা দপ্তরই নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ রটিয়েছিল। শত্রুকে ধোঁকা দেবার জন্যে জাপানীরা গত মহাযুদ্ধে এ ধরনের কারসাজি আরও করেছিল। নেতাজীর বেলায় তাদের এই কৌশলটি খুবই সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

জাপানীদের এ কাজে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। তারা সত্যি সত্যি নেতাজীকে হন্যে ইঙ্গ-আমেরিকান গোয়েন্দা-চক্রের শ্যেন-চক্ষু থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ শুধু খবর রটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। ধোঁকা দেবার জন্যে তারা ভ্রান্ত ফটোগ্রাফেরও ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর সত্যি সত্যি একটা বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল। ওটাকেই তারা নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিল। জাপানী গোয়েন্দারা কর্ণেল হবিবুর রহমানকে ঐ বিমান দুর্ঘটনার নজিরেই ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে দুর্ঘটনাটি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে হয়েছিল। হবিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের নেতাজী তদন্ত কমিটির সামনেও জাপানীদের শিখিয়ে দেওয়া কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। নেতাজীর মৃত্যুর একমাত্র প্রমাণ হিসাবে জাপানীদের

দেওয়া একটি ফটোগ্রাফও তিনি দেখান। আসলে ফটোটি ১৯৪৪ সালে পাহাড়ের চূড়ায় ভেঙেপড়া বিমানটিরই ছবি।

তদবধি ভারতের জনসাধারণকে নেতাজীর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করে আসা হচ্ছে।

* * * *

আজও দিল্লীর গবর্নমেণ্ট নেতাজীর মৃত্যুর কল্পিত কাহিনীকে যে-ভাবে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছেন তাতে সত্যান্বেষী পর্যবেক্ষকদের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হতে বাধ্য যে নেতাজীকে মৃত বলে ঘোষণা করা এবং লোককে তাই মেনে নিতে বলা গদীনসীন সরকারের পক্ষে রাজনৈতিক দিক থেকে সুবিধেজনক।

নেতাজীই ছিলেন একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি গান্ধীবাদী অহিংসায় আস্থা না রেখে সামরিক বলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানির পর ভারতীয় পৌরুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। সুভাষের আগে আর কেউ ভারত থেকে ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতীয় ফৌজী বাহিনী সংগঠনে এগিয়ে আসেননি। স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন দেশ রূপে বেঁচে থাকতে হলে যে-জাতীয় মর্যাদার পুনরুদ্ধার আবশ্যক, সুভাষ তা সম্পন্ন করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় বীরে পরিণত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যরা পলাশীর যুদ্ধের বদলা নিয়েছে। বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁর বীরত্ব ও সামরিক নেতৃত্ব ভারতের সামরিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

ইতিহাস সুভাষকে বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই দুর্ধর্ষ জাতীয় বীর যুদ্ধশেষে দেশে ফিরলে দিল্লির রাজতক্ত টলমল করত।

ব্রিটিশের হাত থেকে যাঁরা ক্ষমতা নিয়েছিলেন সেই ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়টি ভালভাবেই বিবেচনা করেছিলেন। নেতাজীর

ব্যাপারে সত্য উপলব্ধি করেই সরকারী মহল থেকে ঘোষণা চলল—নেতাজী বেঁচে নেই। তাইপেতে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজীর জীবিত থাকার অনুকূলে ঐতিহাসিক ও বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণকে বিকৃত করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।

জনমতের তাড়নায় গভর্ণমেণ্ট ১৯৫৬ সালে নেতাজী তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন। কিন্তু এহেন একটি তদন্তের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শাওনওয়াজই সর্বেসর্বা ছিলেন। সম্ভবত বাস্তবসম্মত কোন তদন্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসুবিধাজনকও বিবেচিত হয়েছিল।

নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ৩য় পৃষ্ঠায় লেখা আছে—কমিটির সদস্যরা বিমান দুর্ঘটনা, নেতাজীর মৃত্যু ও সৎকারের প্রকৃত ঘটনাস্থল তাইপেতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার ও ফরমোজা সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় সেখানে যাওয়া অসুবিধাজনক ছিল। ভারত সরকারকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তাঁরা কমিটিকে জানান, ফরমোজা যেতে দেওয়া সম্ভবপর বলে তাঁরা মনে করেন না। কাজেই তাইপে যাওয়ার চেষ্টা বাদ দিতে হয়।

যে তদন্ত সরেজমিনে করতে পারা গেল না, সেই তদন্তের মানে কি? ফরমোজার জাতীয়তাবাদী চীন সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশিষ্ট সদস্য। ভারত সরকার যদি ফরমোজা সরকারকে তদন্তের সুবিধা দেবার অনুরোধ জানাতেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতেন না। কারণ এটা একটা মানবীয় ব্যাপার।

পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমি বার্লিনে ভারতীয় সামরিক মিশনের সদস্য হিসেবে মিশনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে পূর্ব বার্লিন ও পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালন করেছি।

সত্যান্বেষী পর্যবেক্ষক আবারও এই সিদ্ধান্তে না এসে পারেন

না যে ভারত সরকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই সত্যের মুখোমুখি হতে ভীত যে তাইপের বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গে নেতাজীর কোন সম্পর্ক নেই। ভারত সরকার তাঁদের সব তদন্ত জাপানেই সীমাবদ্ধ রেখে জাপানী গোয়েন্দা দপ্তরের ইচ্ছাকৃত কৌশলমূলক প্রচারের ললাটেই সত্যের ছাপ মেরে দেন।

*   *   *   *

নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তাইপের বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষ্য হিসেবে তিনটি ফটোগ্রাফের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ফটোগুলি উপর-উপর দেখলেও সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। তদন্ত রিপোর্টের রায়—"সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হচ্ছে···বিমানটি কংক্রীট রানওয়ের প্রায় ১০০ মীটার দূরে ভেঙে পড়েছিল।" কিন্তু ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনাস্থল একটি পাহাড়ের চূড়ায় যার দূরত্ব কংক্রীট রানওয়ে থেকে দেড় মাইলের কম নয়। কর্ণেল হবিবুর রহমানও বলেন বিমানঘাঁটির এক বা দু' মাইল দূরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হবিবুর রহমান ঠিকই বলেছেন। ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর সত্যি সত্যি বিমানঘাঁটির এক বা দু মাইল দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিমান ভেঙে পড়েছিল। জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ এই বিমান দুর্ঘটনার কথা বলতেই শিখিয়ে দিয়ে ছিলেন হবিবুর রহমানকে যে দুর্ঘটনা তিনি দেখেননি।

তাইপেতে অনুসন্ধানের সময় আমি নিজে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ের চূড়া ও রানওয়ের কয়েক ডজন ফটো তুলেছি। ১৯৪৪ সালে পাহাড়-চূড়ায় বিমান দুর্ঘটনাস্থলের যে ফটো আমি তুলেছি তা নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্টে প্রদর্শিত রানওয়েতে দুর্ঘটনার—যা ১৮-৮-১৯৪৫ সালে হয়েছিল বলে কথিত ফটোর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ফটোগ্রাফের পটভূমিকায় য়ুয়ানসান পাহাড়ের দৃশ্য নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ফটোও আমার তোলা ফটোর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত। আর কিছু না হোক, এই ফটোগ্রাফগুলি থেকে এই

সত্যই জানা যাচ্ছে যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইপেতে কোন বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। কাজেই নেতাজী সেখানে মারা যান, একথাও সত্য নয়।

ভারত সরকার নিশ্চয়ই চান না নেতাজীর আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হোক। এ জন্যেই নেতাজী তদন্ত কমিটির সদস্যরা সরকারের বিশ্বাস-ভাজন হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাঁদের তাইপেতে যেতে দেননি। নেতাজী ও তাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে অন্ধকারে রাখার জন্যেই সদস্যদের তাইপেতে যাওয়ার পথে কূটনৈতিক বাধার অজুহাত তোলা হয়েছে।

খাস ফরমোজা দ্বীপে অনুসন্ধান চালিয়ে আমি নিজে যা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে: নেতাজী ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বেলা ২-৩০ মিনিটে বিমানে দাইরেন যাত্রা করেছিলেন। এবং ওই দিনই সন্ধ্যায় নিরাপদে তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলেন।

॥ ৬ ॥

নেতাজীর সেই নির্দেশঃ দাইরেন চল

১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপানীরা আত্মসমর্পণ করলেও নেতাজী আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি বলেছিলেন—'জাপানের আত্মসমর্পণ মানে তাঁর আত্মসমর্পণ নয়।' ভারতের স্বাধীনতার জন্যই তাঁর সংগ্রাম। জার্মান ও জাপানীদের যাই হোক না কেন, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

তিনি এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির হাতে পড়তে চাননি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রাশিয়ানদের কোন অঞ্চল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। সেদিনের সামরিক পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব ছিল। একমাত্র দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন থেকে।

পঁয়তাল্লিশের ১৫ই আগস্ট নেতাজীর লিখিত আদেশে বলা হয়—"সামরিক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। উৎসাহ ও সাহস বজায় রাখতেই হবে। ভারত স্বাধীন হবে এ বিশ্বাস যেন কেউ মুহূর্তের জন্যও হারিয়ে না ফেলে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীন রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবেই এবং সেদিনের আর দেরী নেই, জয় হিন্দ।"

*　　*　　*　　*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার আগে সবকিছু যেন দাইরেনে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। নেতাজী মাঞ্চুরিয়ার সামরিক পরিস্থিতির হিসাব-নিকাশ করেন। ১১ই আগস্ট রুশ দেশের রেডিওতে বলা হয়—মার্শাল এ ভি ভ্যাসিলেভস্কির নেতৃত্বে লালফৌজ মাঞ্চুরিয়া দখলের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। চল্লিশ বছর আগে জাপানীরা পোর্ট আর্থার ও দাইরেন রাশিয়ানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। মার্শাল সেই প্রতিশোধই নিতে চান।

দাইরেনে রুশ দেশের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও টোপ ফেলেছিলেন। ৪৫-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী ইয়াল্টায় যে গোপন চুক্তি হয় তাতে দাইরেন সম্বন্ধে একটি ধারা থাকে। সেই ধারায় দাইরেনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়। কিন্তু স্ট্যালিনের চাপে সেই ধারা সংশোধন করে বলা হয়,—তবে সোভিয়েট স্বার্থ প্রাধান্য পাবে। এ ব্যাপারে রাশিয়ানরা গোপনে জাপানের সঙ্গেও কথাবার্তা চালায়। ৪৫-এর জুলাইয়ে জাপানও দাইরেনে সোভিয়েট কর্তৃত্বে রাজী হয়।

নেতাজী দাইরেনের এইসব ঘটনা ভালভাবেই জানতেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না যে, দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার আগে রাশিয়ানরা দাইরেন দখল করে নেবে। এ কারণেই দাইরেনের কথা তিনি বেশী করে ভাবতেন। সোভিয়েটের কোন এলাকা থেকে যুদ্ধ চালানো অর্থে তিনি দাইরেনকেই বোঝাতে চাইতেন।

* * * *

নেতাজী তখন দাইরেনে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ ৬ই আগস্ট আমেরিকানরা হিরোশিমায় এ্যাটম্ বোমা ফেলল। ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে এই বোমা দুইটি জাপানীদের মনোবল একেবারে ভেঙে দেয়। এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির কাছে তাদের আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এই সুযোগে রাশিয়ানরা মাঞ্চুরিয়া দখলে কৃতসঙ্কল্প হয়। ৮ই আগস্ট তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। জাপানীরা এ্যাংলো-আমেরিকানদের বাধাদান বন্ধ করে। কিন্তু রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এই ঘটনা নেতাজীর পরিকল্পনার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমার এক পরিচিত লোক ১৮ই আগস্ট বিকালে তাইপে থেকে নেতাজীর রওনা হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এই লোকটি এক সময় চীনের চর হিসাবে ভারতে ছিল। তারপর তাকে তাইপে পাঠনো হয়।

লোকটি জানায়—রওনা হওয়ার সময় নেতাজীর পরনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পোশাক ছিল। জেনারেল শিডির সঙ্গে তিনি বিমানে গিয়ে ওঠেন। প্রধান পাইলট ককপিট থেকে তাঁকে স্বাগত জানায়।

তারপর নেতাজী তাকে নির্দেশ দেন—দাইরেন চল।

॥ ৭ ॥

তাইপে বিমানঘাঁটিতে

১৯৬৪ সালের শেষে তাইপে বিমানঘাঁটিতে কর্ণেল ইয়ের সঙ্গে আমি আবার দেখা করলাম। বিমানে পিকাডোর দ্বীপপুঞ্জের নিয়মধরা সমীক্ষা সেরে তখন তিনি সবেমাত্র অবতরণ করছেন। কয়েকবার সাক্ষাতে আমাদের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। নেতাজী সম্পর্কে তাঁর রাষ্ট্রের যাবতীয় গোপন তথ্য এখন তিনি অসঙ্কোচেই আমাকে বলেন।

স্মিত হেসে তিনি আমাকে অভিবাদন জানালেন, নেতাজীর সেই সংগ্রাম ধ্বনি দিয়ে "দিল্লী চলো"।

তাঁর খোস মেজাজ লক্ষ্য করে আমিও নেতাজীর প্রতিধ্বনি করলাম "দিল্লী দূর অস্ত, পহলে দাইরেন চলো"।

প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর থেকে তখন দাইরেনের দিকেই আমার মন টানছে

*　　　*　　　*　　　*

তা হলে কর্ণেল, আপনার ধারণা নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় পড়েনি। তিনি সত্যিই দাইরেনে পৌঁছান।"

"আমার ধারণা!···মানে, আপনি কি বলতে চান? ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট বেলা আড়াইটায় নেতাজী দাইরেন যাত্রা করলেন আমি দেখেছি। চুংকিং সরকারকে এ খবর আমি জানিয়েছি।"

খবরটা কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছে, এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, "তাইপে বিমানক্ষেত্রে তখন আপনি কি করতেন?"

"এই বিমানক্ষেত্রের জাপানী সামরিক ক্যান্টিনে একটা বয় হিসাবে কাজ নিই। অফিসার ও গণ্যমান্যদের যাবার পথে চা প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নের হাল্কা খানা পরিবেশন করা আমার কাজ ছিল।"

"তিনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তা আপনি কি করে জানলেন ?"

"তিনি যখন কংগ্রেস সভাপতি তখন কলকাতায় তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য রাখা আমার কাজ ছিল।"

"স্বার্থ ?"

"ব্যক্তিগত কিছু নয়। চুংকিং সরকারের হুকুম তামিল করেছি মাত্র।"

"নেতাজীর দাইরেন যাত্রার সময় আপনি যা দেখেছেন তার আরও কিছু বিবরণ দয়া করে দিন।"

"বিশ্বাস করুন, সেদিনের তৎপরতা সম্পর্কে যে সব জাপানী গোয়েন্দা খোঁজ রাখার কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের চেয়ে আমি বেশী খবর রাখি।"

"যথা ?"

"জানেন, সেদিন ১৮ আগস্ট। হোমরাচোমরা জাপানী অফিসারদের একটা দল আত্মসমর্পণের সাদা নিশান উড়িয়ে ওকিনাওয়ায় আমেরিকান সদর ঘাঁটিতে গেল। অন্যান্য যুদ্ধ ঘাঁটির মত এখানকার জাপানী সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে গররাজী ছিলেন। তাই সব জাপানী সেনাপতিদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সম্রাটের ব্যক্তিগত আদেশ পৌঁছিয়ে দেবার পথে একজন জাপানী রাজকুমার এখানে আসেন। তাঁর সম্মানে এখানে একটা বিশেষ তাঁবু খাটানো হল। আর ত্রিশ পদের খানা তৈরির ভার পড়ল আমাদের ক্যান্টিনের ওপর। অতিরিক্ত পরিচর্যার ভার পেলাম আমি। তেমনি জেনারেল শিডির সঙ্গে নেতাজী যখন এখানে পৌঁছলেন তাঁদের চা পরিবেশন আমি করেছি। ইংরেজী ভাষায় আনপড় আমি এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তাই জাপানীরা তাদের প্ল্যান সম্পর্কে নেতাজীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করল সেখানে। আমি যে সব সময়েই তাঁবুতে হাজির রয়েছি সেদিকে তারা কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না।"

"কি প্ল্যান নিয়ে নেতাজীর সঙ্গে তাদের আলোচনা হল ?"

"নেতাজী দাইরেন বিমানক্ষেত্রে সেদিনের পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। আলোচনাকালে জাপানী গোয়েন্দা অফিসার জানালেন, দাইরেনে আমেরিকানরা অবতরণ করতে পারে এমন একটা আশঙ্কা রাশিয়ানদের মধ্যে রয়েছে। সেজন্য তাদের বিমানবাহিনী দাইরেন দখলে তৎপর হয়ে উঠেছে। খবরটা শুনে নেতাজী মন্তব্য করলেন—'এক্ষুণি দাইরেন যেতে হবে আমাদের।'"

"এমন আদেশ নেতাজীর মানায়।"

"তিনি ত্বরিতগতিতে চললেন। জেনারেল শিডিও তাঁর অনুগমন করলেন। বিমানে উঠেই নেতাজী পাইলটকে আদেশ দিলেন—'দাইরেন চলো।'"

"একটা সুচিন্তিত আদেশ।"

"বিলক্ষণ। বিমান ছেড়ে দিল। ঠিক আড়াইটা তখন বিমানখানা আকাশে উঠে গেছে।"

"জাপানীদের খবর—রানওয়ে থেকে একশ মিটারের মধ্যেই বিমানখানা দুর্ঘটনায় পড়ে চুরমার হয়ে যায়।"

"এটা একটা নিছক বানানো সংবাদ। নেতাজীর ভারতীয় সহচরকে শিখিয়ে পড়িয়ে বিশ্বাস করানো হয়। নেতাজীর বিমানখানি যখন উত্তর আকাশে মিলিয়ে গেছে তখন তিনি তাইপেতে পৌঁছান।"

"জাপানী অফিসার যখন নেতাজীর সহচরকে দুর্ঘটনার গল্প শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন কি আপনি সেখানে ছিলেন ?"

"নিশ্চয়ই। সে-তাঁবুর মধ্যে তাঁদের আমি চা এবং রাজকুমারের জন্য তৈরী খানাপিনার অবশিষ্টটুক পরিবেশন করি। তারা জানত—আমি ইংরেজীতে আনপড় আদমী। সেজন্যে তারা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলে। কিন্তু শুধু সেদিনটায়ই নয়, তারপরদিন থেকে অন্ততপক্ষে দশদিন হবে রোজ জাপানী গোয়েন্দা কর্মচারী কয়েকবার নেতাজীর সহচরের সঙ্গে ক্যান্টিনে এসেছে।

প্রতিদিনই বিমান তুর্ঘটনার খবর কিভাবে রটাতে হবে সেই নিয়ে আলোচনা করেছে তারা।”

“আপনি আমার কাছে যেমন বর্ণনা করলেন তাতে আমি সুনিশ্চিত হলাম আপনি যা বলেছেন সবটুকুই খাঁটি সত্যি।”

আমার অনুরোধে ইয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যুদ্ধের সময় দাইরেনে তাঁর যে সহকর্মী চুংকিং সরকারের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন তাঁকে তলব করবেন। আমরা ঠিক করলাম য়ুয়ানশানের পাদদেশে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। এখান থেকেই যে কেউ তাইপের বিমানঘাঁটি সুন্দর নিরীক্ষণ করতে পারেন।

* * * *

কর্ণেল ইয়ে তাঁর দাইরেনের সহকর্মীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর নামটি হল মিঃ তিং। মিঃ তিং নিজের জন্যে তু' পেগ হুইস্কীর অর্ডার দিলেন। কিছুক্ষণ পিকিং আর সাংহাইয়ের খানাপিনার গল্প করলেন। তাঁর মতে চিকমরা (চীনা কম্যুনিস্ট) তাইপের সৌন্দর্য বর্বরদের মত ধ্বংস করার আগে চীনা জীবনযাত্রার প্রতীক ছিল এই তাইপে। মুহূর্তের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ ধ্বনি 'বোস' সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল।

মিঃ তিং এখন তাইপেতে ব্যবসায়ীর জীবন শুরু করেছেন। তার আগে জাতীয়তাবাদী চীন সরকার মূলভূমি ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি চুংকিং সরকারের একজন অন্যতম গোয়েন্দা কর্মচারী ছিলেন। তিনি বললেন, “একজন গেয়েন্দাকে অবশ্যই জুতা পালিশ থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত জানতে হবে। কলকাতার বৌবাজারে আমি একসময়ে মুচির কাজ করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আপনি যখন কলকাতায় থাকতেন এবং রাজনীতিতে আপনার ঝোঁক ছিল বলুন তো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পেরেছেন কি? নিশ্চয়ই নয়। তেমনি আমিও তাঁর একজন গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। যুদ্ধ বাধার

পূর্বমুহূর্তেই মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সামরিক তৎপরতার গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচরের জাল বিস্তারে আমি দাইরেনে ঢুকে পড়ি। দাইরেনে একটা 'বিউটি সেলুন' খুলে বসলাম। হোমরাচোমরা জাপানী অফিসারদের আমি হলাম হেড নাপিত। দাইরেনের সামরিক গুরুত্ব হেতু বুঝতেই পারছেন, তিন-পক্ষই আমাকে তাদের গুপ্তচরের কাজে লাগাল।"

"ত্রি-পক্ষীয় গুপ্তচর ?"

"খুব স্বাভাবিক। আমি জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের গোয়েন্দা কর্মচারী। বিশেষ ধরনের খবর সংগ্রহের জন্য জাপানী ও রাশিয়ানরা আমাকে তাদের একান্ত বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করল। যাক, আমি কিন্তু আমার আপন সরকারের সততার সঙ্গে সেবা করেছি। আমার দেশের শত্রুরা আমাকে গোলাম বানাতে পারেনি—প্রতারণা করা তো দূরের কথা। চিকমদের (চীনা কম্যুনিস্ট) তো ধর্তব্যের মধ্যে মনে করিনি। তাদের আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা করি কারণ তারা সর্বকালের জন্য চীনা জাতীয় জীবনে ঘৃণিত কীট। তারা জাহান্নামে যাক।"

মিঃ তিং রাশিয়ান ভাষায় শপথ নিলেন। রাশিয়ান ভাষায় তাঁর দখলে অভিনন্দন জানাতে তিনি অনর্গল কথা শুরু করলেন রাশিয়ানে। তাঁর উচ্চারণ থেকে ধারণা হবে যেন তিনি সাইবেরীয়। একটা বড় হাই উঠিয়ে তিনি বললেন, "তাই স্বাভাবিক ভাবেই, সুভাষবাবু যখন দাইরেনে পৌঁছলেন, আমিই সর্বপ্রথম তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। যাতায়াতের পথে জাপানী হোমরাচোমরাদের জন্য তৈরী বিলে ভিলায় অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। রবিবারের সকাল। নিষ্ঠাচারী ক্যাথলিক আমি। গীর্জা যাবার পথে আমাকে দেখে জাপানী চীফ অব স্টাফের গাড়িতে আমাকে জাপানীরা উঠিয়ে নিল। তারা বলল, "ক্ষুরকাঁথা নিয়ে আমাকে এক বিশেষ কাজে এখনি তাদের অনুগমন করতে হবে।"

"আপনার এই পেশা খুব কাজে লেগেছে।"

"সেই ভিলায় কাকে দেখলাম জানেন? নেতাজার পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। এই ইউনিফর্মে তাঁর ছবি আমি বহুবার জাপানী সংবাদপত্রে দেখেছি। তাই, তাঁকে চিনতে আমার অসুবিধা হয়নি। প্রায় ছ-বছর ব্যবধানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য তাঁর মাথার সামনে টাকে চুল গজায়নি। ঘাড়ের চুলে কেবল পাক ধরেছে। পেশাদার নাপিত হিসেবে দেখলাম তাঁর প্রতিভাধর চেহারার অনাবিল স্বভাব-সৌন্দর্যকে তাজা করার জন্য দরকার কেবল ঘাড়ের চুল ছেঁটে দেওয়া।"

"চমৎকার মনোজ্ঞ আপনি।"

"তাঁর কাছে গিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, "ইওর এক্সেলেন্সী!" মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সংশোধন করে বাংলায় বললাম, "নেতাজী, আসুন, চুল কামিয়ে দিই।"

"বহুদিন বাদে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মাতৃভাষা আপনার মুখে শুনলেন।"

"ঠিক তাই। তাঁর স্বভাব-হাসিমাখা স্বরে আমাকে ঠিক পরিচিত স্বজনের মত জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বাংলা কোথায় শিখলে?'"

মিঃ তিং বললেন, 'আমি উত্তর দিলাম—কলকাতায়।' তাঁর বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে এই পরিচয়টুকুই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন। আমি কাপড় দিয়ে তাঁর গা ঢাকতে যাচ্ছি তিনি আমাকে বাংলায় রেডিও খুলে দিতে বললেন।"

মিঃ তিং বললেন, "আমরা আমেরিকান সংবাদে শুনলাম—চীনে জাপানীরা হাজারে হাজারে আত্মসমর্পণ করছেন। রাশিয়ানরা চারজন জাপানী সেনাপতিকে বন্দী করেছে।"

নেতাজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কি শিডি আছে? মিঃ তিং জানালেন, তিনি নেতাজীর এই প্রশ্নের উত্তর

দিতে পারলেন না। স্বগতভাবে নেতাজী বাংলায় বললেন, "দাইরেনের পতন শীগগিরই হচ্ছে।"

আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেখানে হোটেলের কোন আগন্তুক ঢুকলেন। একজন বয় এসে জানাল, "ভদ্রলোক, রাত্রের খানা তৈরী।"

॥ ৮ ॥

১৯৪৯ সালের একটি ফটো

নৈশ-ভোজনের সময়। সেদিকে খুব চিন্তা না করে তিং এবং ইয়ের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালাম তাইপে গ্র্যাণ্ড হোটেলের কাঁচের বারান্দায়। সেখান থেকে আমরা এক নজরে দেখলাম—য়ুয়ানশান পর্বতমালার ওপরে বাতির সারি, আলোয় ঝলমলে বিমানক্ষেত্র এবং নগরীর প্রধান সড়ক দিয়ে চলমান মোটরকারবাহিনীর হেড লাইট। ডানার রক্তিম, পীত ও সবুজ বাতির উঁকিঝুঁকি মেরে একটা যাত্রিবাহী জেট উড়ে যাচ্ছে উত্তরাপথে।

তিং নিজের জন্য আবার দু পেগ হুইস্কীর ফরমাশ করলেন। তখনও তিনি স্মৃতিচারণের মেজাজে। তাঁকে উত্তেজিত করে আরও কিছুটা সংবাদ আদায়ের চেষ্টায় বললাম, "নেতাজী সম্পর্কে আপনার সংবাদ যেন অলীক ঠেকছে। আচ্ছা, এমন কিছু আপনি দেখাতে পারেন যাতে আপনার কথা যাচাই করা যায়?"

"প্রমাণ চান?" আমার দিকে সোজা দৃষ্টি হেনে বললেন, "আমার সঙ্গেই একটা আছে। এটি নিশ্চয়ই আপনাকে খুশী করবে।"

কোটের পকেট থেকে একটা বড় পোর্টমনিব্যাগ বের করলেন মিঃ তিং। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার মধ্যে আঙুল পুরে একটি ফটো টেনে নিয়ে তিনি আমার সামনে রেখে বললেন, "কেমন, ডক্টর সিন্‌হা! এই লোকটিকে আপনি চিনতে পারছেন? ভাল করে নিরীক্ষণ করুন।"

দেখতেই চিনতে পারলাম, এটি সুভাষবাবুর। বিলক্ষণ এটি তাঁরই ফটো। প্রতিভাদীপ্ত সৌহার্দ্যময় দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটি আপন-ভোলা স্মিত হাসির প্রশ্ন—অতঃপর? কুনফুসীয় পণ্ডিতের বেশে একজন সন্ন্যাসী। সেই প্রশস্ত

কপাল। দীর্ঘায়ত নিরীক্ষণকারী দৃষ্টি। এটি আর কারও হতে পারে না। সুভাষেরই ছবি।

কিন্তু তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে এই বেশে কখনও দেখেনি। এটি বার্লিনের সেই য়ুরোপীয় বেশ নয় বা যুদ্ধের দিনে দূরপ্রাচ্যের সামরিক ইউনিফর্মধারী বেশ নয়। মাঞ্চুরিয়া থেকে আগত চীনা কনফুসীয় পণ্ডিতের আলখাল্লায় ভূষিত নেতাজীর প্রতিকৃতি। পটভূমিতে রয়েছে একটি বন্দরের প্রাকৃতিক দৃশ্য। তিং বললেন এটি দাইরেন বন্দর। ছবিটি দেখলে মনে হবে নেতাজী তখন অস্বাভাবিকভাবে গভীর চিন্তামগ্ন। ছবিটি নেতাজীর অজ্ঞাতসারেই টেলিলেন্সে নেওয়া। তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর ছবি নেওয়া হচ্ছে।

"ছবিটি কবেকার ?" আমি মিঃ তিংকে প্রশ্ন করলাম।

"১৯৪৯-এর গ্রীষ্মে।"

"আপনি সুনিশ্চিত ?"

"আলবাত্। এই বছরেই আমরা চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে আসছিলাম। তখন পর্যন্ত দাইরেনে আমাদের গুপ্তচরদের সঙ্গে আমার প্রায়ই যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়েছিল। আমার একজন বিশ্বস্ত সহচরের কাছ থেকে আমি এই ফটোটি পাই। সে তখন রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে কয়েকমাস ছিল।"

"আপনি নেতাজীকে শেষ কবে দেখেছেন ?"

"১৯৪৮এর বড়দিনে। এই সময়ে আমি কোনক্রমে দাইরেন থেকে সরে পড়ি। নেতাজীর সঙ্গে একই নগরে আমি তিন বছর কাটিয়েছি। রাশিয়ান গুপ্তচরদের খপ্পর থেকে নেতাজীকে মুক্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টাও করেছি।"

"কেমন করে সম্ভব হল ?"

"তাহলে আমাকে ১৯৪৫-এর ২২শে আগস্ট থেকে কাহিনী শুরু করতে হবে। সেটি চীন-রুশ সম্পর্কের মসীমাখা দিন।"

"মসীময় দিন কেন ?"

"রাশিয়ান সেনাবাহিনী সেদিন দাইরেন প্রবেশ করে। শুধু যেসব জাপানী তাদের সঙ্গে লড়াই করেছে তাদের নয়, এমন কি তাদের মিত্র নিরীহ চীনাদেরও তারা পাশবিকভাবে খুন করেছে। প্রকাশ্যে রাশিয়ানরা চীনা নারীদের উপর নিগ্রহ চালিয়েছে। নগরে আমাদের সব ধনসম্পত্তি, কারখানা ও যন্ত্রপাতি লুঠতরাজ করেছে। চীনা অসামরিক অধিবাসীদের ওপর রুশ অত্যাচার নেতাজীর মনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়।"

মিঃ তিং বললেন, "নেতাজী প্রথমে মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল ভ্যাসিলভস্কীর সঙ্গে যোগাযোগের চিন্তা করেন। তিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে নেমেছেন এটি রাশিয়ানদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। এবং তারপর তাঁর কাম্য ছিল লক্ষ্যসাধনের জন্য রাশিয়ান সহযোগিতা। আত্ম-নিরাপত্তার কোন চিন্তা না করে দেশের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান। কিন্তু নিরীহ অধিবাসীদের ওপর রুশদের বর্বরতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করল। রুশদের নজরের বাইরে থাকার চেষ্টা আমি সব সময়েই করেছি। রাশিয়ান গোয়েন্দা পুলিসের ক্ষমতা অসীম। তাঁর পক্ষে মস্কোর ওপরওলাদের কাছে এ খবর প্রকাশ করা খুবই কঠিন ছিল যে একজন "বিশিষ্ট যুদ্ধাপরাধী" তাঁদের বাহিনীর চোখে ধূলি দিয়ে দাইরেনে বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মস্কোয় খবর পাঠাবার আগেই তাঁরা নেতাজীকে হত্যা করতেন। তাই যতদিন বাইরে থেকে কোন ব্যবস্থা না হয় ততদিন নেতাজী আত্মগোপন করে থাকবেন এরূপ ব্যবস্থা করেছি।"

"বাইরে থেকে মানে ?"

"মানে যতদিন নেতাজীর স্বদেশ উচ্চ পর্যায়ে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা না চালায়।"

"নেতাজী যে দাইরেনে জীবিত রয়েছেন ভারত সরকার জানতেন না ?"

"এ খবর পৌঁছিয়ে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।"

"কেমন করে ?"

"নানকিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে নিজে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছি।"

"তাঁরা কি জবাব দিয়েছেন ?"

"চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তখন আপনাদের মিত্র সম্পর্ক। আপনারা তাঁদের এতটা বিশ্বাস করেছেন যে তাঁরা আমাকে আমেরিকার মাইনে-করা দালাল ধরে নিয়েছিলেন।"

তিং বলেন, "পিকিংয়ে চিকমদের সঙ্গে আপনাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর, দিল্লি থেকে নেতাজী প্রসঙ্গ ওঠাবার আর কোন আশা রইল না।"

"আপনি কি করে তা বলতে পারেন ?"

"আমি জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের একজন কর্মচারী। নেতাজীর খবর রাখাই আমার কাজ ছিল। চিকমদের সঙ্গে দিল্লির তখন দহরম মহরম। আমাদের কোন প্রসঙ্গই তখন দিল্লির কানে পৌঁছানো দায় ছিল। আমি কোনদিনই আশ্চর্য হব না যদি ভবিষ্যতে প্রকাশ পায় যে চিকমদের প্রভাবেই দিল্লী একগুঁয়েভাবে নেতাজীকে মৃত বলে গণ্য করে আসছে।"

"নেতাজীর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে আমরা দূরে চলে যাচ্ছি। নেতাজীর দাইরেন-বসবাস সম্পর্কে আপনি যা জানেন তাই বলুন।"

"খাওয়ার পরে আবার বলব।"

* * * *

"নেতাজীর দাইরেনের ফটোটা দিন না।" শান্তস্বরে মিঃ তিংকে অনুরোধ করলাম।

"এটা দিতে পারি না। দাইরেনে আমার পরবর্তী ব্যক্তি চিকমদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ফটোটি যদি মস্কোর হাতে চলে

যায় কে বলতে পারে নেতাজীর অনুরক্ত কয়েকটি পরিবারকে রুশরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে না ?"

"তাহলে আপনি আমাকে এটি দেখালেন কেন ?"

"তা না হলে নেতাজী যে তাইপে দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারিয়ে দাইরেনে পেঁৗছেছিলেন একথা আপনি বিশ্বাস করতেন না, যেমন আপনাদের সরকার ভারতবাসীকে বিশ্বাস করাতে চান।"

"আপনি জানেন এটি ভারতীয়দের কাছে রোমাঞ্চকর সংবাদ।"

"শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়। এশীয়দের সঙ্গে রুশ সম্পর্কের মধ্যে এটি বিস্ফোরণের উপযুক্ত।"

"আবার আমরা নেতাজী প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। রুশরা দাইরেনে ঢোকার পর তাঁর কি হল বলুন।"

"সামরিক বেশ ত্যাগ করে কনফুসীয় পণ্ডিতের আলখাল্লা পরার জন্য আমার অনুরোধে নেতাজী সম্মত হলেন। তাঁর মুখের আদল কনফুসীয় পণ্ডিতদের মত। এতে আমাদের খুবই সুবিধা হল। আমার একজন ব্যবসায়ী বন্ধুর ব্যক্তিগত মন্দিরে তাঁকে নিয়ে গেলাম। সত্যিই সে তাঁর যত্ন আপ্যায়ন যথাসাধ্য করেছে। তাঁর বাসস্থানের পরিচয় দিলাম বর্মাপ্রান্তের হুয়েনান প্রদেশ। তাঁর নামকরণ হল তাও-লিন। আমার কাছে প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারের কয়েকটি অলিখিত পাসপোর্ট ছিল। তার একটাতে নেতাজীর ফটো সেঁটে দিলাম। নাম লিখলাম তাও-লিন। জন্মস্থান য়ুয়েন। তারিখ ২৩শে অক্টোবর ১৮৯২ সাল।"

"তাহলে নেতাজী এইভাবে চীনা বনলেন ?"

"আমি বলব, চীনা আশ্রয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের সরকারের দাইরেন সম্পর্কে একটা সন্ধি হল ১৯৪৫ সালের ২৬শে আগস্ট। এই সন্ধির ফলে দাইরেন অবাধ বন্দর ঘোষিত হল। ঠিক হল বন্দরের অধিকর্তা একজন রাশিয়ান হবে।

দাইরেনের বাইরে যাবার নিয়ন্ত্রণ অধিকার রইল তাঁর উপর। ফলে দাইরেন নগরীর বাইরে যাওয়া বা জগতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা খুবই কঠিন হল। নেতাজী বাইরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় বৃথা রইলেন।"

"নেতাজীর পক্ষে এটা বিলক্ষণ নৈরাশ্যকর।"

"স্বাভাবিক। উপায় নেই। এ অবস্থা তাঁকে ভোগ করতে হল। তারপর রাশিয়ানরা চীনাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। দেখাতে হল তাদের পাসপোর্ট। চিকম দোস্তরা একাজে তাদের সহায়তা করল। যা হোক, যতদিন আমি দাইরেনে ছিলাম ততদিন এ সম্পর্কে নেতাজীর কোন চিন্তার কারণ হয়নি। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াল, যেদিন মাছধরা বোটের মাঝি সেজে আমি দাইরেন থেকে সরে পড়লাম। তাঁর জন্যও এই পথ ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব ব্যর্থ। জানেন, চীনাদের কতকগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক ছলচাতুরী জানা আছে, যা অন্যের পক্ষে নকল করা কঠিন।"

"স্বীকার করি।"

"তারপর এল সেই ১৯৪৯-এর দুর্দিন। আমাদের সরকারকে মূলভূমি ছেড়ে ফরমোজায় চলে আসতে হল। এই সময় আমাদের বহু গোপনীয় নথি চিকমদের হাতে পড়ে।"

"সারা দুনিয়ার জাতীয়তাবাদী চীনাদের একটা প্রচণ্ড আঘাতের দিন সেটি।"

"নেতাজীও এই আঘাত থেকে মুক্তি পাননি।"

"তাঁর কি ঘটল?"

"চিকম গোয়েন্দা পুলিস দাইরেনে ঢুকল। তারা আমার ক্রিয়াকলাপ টের পেল। তার সঙ্গে পেল নেতাজীর সংবাদ। নেতাজীর খবর সম্পর্কে তারা রুশদের হুঁশিয়ার করে দিল। শীগগিরই নেতাজী রুশদের হাতে ধরা পড়লেন।"

"তারপর থেকে তাঁর খবর কি?"

"তাইপে থেকে দাইরেনের সংবাদ রাখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু আপনাকে কিছুটা সূত্র দেব যাতে করে আপনি আরও খোঁজখবর নিতে পারেন।"

নেতাজী রাশিয়ানদের কবলে—এ খবরটি আমার অনুসন্ধানের গতি পরিবর্তন করল।

॥ ৯ ॥

রুশীদের হাতে নেতাজী

আজ ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৫ সাল। আমাদের ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের পঞ্চদশ বার্ষিকী দিবস। তিনদিন আগে আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করেছি।

ঘুম ভাঙতেই নজর পড়ল তিন শব্দবিশিষ্ট রাশিয়ান লেখাটির উপর। "বসৃপমৃনিশে মায়্ জয় হিন্দ।" মনে রেখো আমার জয় হিন্দ।

তিব্বতের চীনা কম্যুনিস্ট চিকম বন্দীশালা ফেরত জনৈক সৈনিক কর্মচারী আমাকে এটি দেন।

বাণীটি নিশ্চয়ই রুশদের কবলগ্রস্ত আমাদের কোন স্বদেশবাসীর। একথা ভাবতে গেলে আমি বিস্মিত হই।

ক'বছর আগে আমাদের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আমার দারুণ মতবিরোধ হয়। চিকমরা ভারৎ স্বাধীনতা ধ্বংস করার মতলব ভাঁজছে। রাশিয়ায় থাকার সময় এ সম্পর্কে কাগজপত্র আমার হস্তগত হয়। সেগুলি আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি।

চিকম বাহিনীর প্রতিরোধে সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির আন্দোলন করার অপরাধে ছ বছর আগে আমাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগে চিকম চরদের শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ভারতের প্রতিরক্ষায় আমার কাজে তাদের মতলব হাসিলে অসুবিধা হয়ে পড়ে। তাদেরই চক্রান্তে আমাকে শেলের মধ্যে পুরে দেওয়া হল। অবশেষে মুক্তি পেলাম যেদিন জওহরলালজী স্বয়ং আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন।

মৃত্যু-শেল থেকে মুক্তি পেলাম ১৯৬৩ সালের ৩১শে জানুয়ারীর রাত্রে। সেদিনের মত আমি জীবনে আর কখনও এত ভেঙে পড়িনি! সেই রাত্রেই জেলের একটা শতচ্ছিন্ন কম্বলে দেহ ঢেকে হাজারীবাগ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে ৬৮ মাইল দূরে রাঁচী শহরে আমাকে ছোট্ট কুঠি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পড়ি-মরি করে গভীর রাত্রে রাঁচী রোডের রাস্তায় উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম জনৈক সৈনিক কর্মচারীর গাড়ি যাচ্ছে। হাত দেখাতে তিনি গাড়ি থামিয়ে আমাকে ভেতরে উঠিয়ে নিলেন। একটা গরম কোট আমার কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে ইঙ্গিত করলেন তার মধ্যে হাত দুটি পুরে দেবার জন্য। আমাকে বললেন, "খিদে পেয়েছে? আমার কাছে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ আছে। মুখে পুরুন তো। তারপর শুনব কোথায় যাবেন। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। শুনেছি কাছাকাছি একটা মানুষখেকো বাঘ আছে। কিন্তু যাই হোক, বর্বর চিকমদের থেকে সেটা নিশ্চয়ই হিংস্র নয়।"

কাছের একটি পেট্রল পাম্পে তিনি গাড়ি থামালেন। পেট্রল ভর্তির পর আমাদের আলাপ হল। তিনি হলেন ক্যাপ্টেন···। তিব্বতে চিকমদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর রাঁচীতে তাঁর ইউনিটে ফিরছেন। চীনা আক্রমণ সম্পর্কে আমার বই তিনি পড়েছেন। সেই সূত্রে আমি তাঁর পরিচিত। তাঁর পকেটে হাত পুরে একটুকরো কাগজ বের করে আমাকে বললেন, "রাশিয়ান ভাষায় এটি কি লেখা বলতে পারেন?"

এই সেই তিন শব্দবিশিষ্ট অবিস্মরণীয় বাণী। আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনার হাতে এটি কি করে এলো?"

"খুবই অস্বাভাবিকভাবে। তিব্বতের চিকমবাহিনীর একজন চীনা-রুশ সলাকার গোপনে একদিন এটি আমার হাতে দেন।"

"চীনা-রুশ?"

"হ্যাঁ, মানে দোআঁশলা লোক। দাইরেন থেকে তিনি তিব্বতে পৌঁছেছেন। ম্যাপে দাইরেনকে চীন-সোভিয়েট যুক্ত এলাকা বলে দেখানো হয়েছে। তাঁর নাম আইভান লিং। তিনি আমাকে জানান যে, জনৈক ভারতীয় দাইরেনে জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের আশ্রিত ছিলেন। চিকমরা পিকিং দখলের পর তাঁকে রাশিয়ানদের হাতে সমর্পণ করে।"

"রাশিয়ানরা তাঁর কী করল ?"

"জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাশিয়ানরা কেজিবিতে (রাশিয়ান গোয়েন্দা পুলিশ ঘাঁটি) তাঁকে নিয়ে যান। আইভান সেই বন্দিশালায় ওয়ার্ডার ছিলেন। আইভান সেই ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পাতান। আইভান বলেন, তিনি মরিয়া হয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। আইভান যেদিন তাঁকে জানালেন যে, তিনি তিব্বতে চিকমদের ঘাঁটিতে বদলি হয়ে রওনা হচ্ছেন তিনি তখন এই কাগজের টুকরোয় তিনটি শব্দ লিখে দেন। বলেন, তাঁর এই বাণী নিশ্চয়ই একদিন তাঁর জন্মভূমিতে পৌঁছাবে।"

"এ বাণী কার হতে পারে ?"

ক্যাপ্টেন নিরুত্তর।

এই বাণী সর্বদাই আমায় অনুপ্রেরিত করেছে। আমার যা কিছু সম্বল আছে তাই দিয়ে আমি ফিনল্যাণ্ড থেকে ফরমোজা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই বাণীর প্রেরকের অনুধাবন করেছি।

* * * *

এ বছরে ২৬শে জানুয়ারী রাঁচীর স্থানীয় সেনাদল টেগোর হিলের পাদদেশে কুচকাওয়াজ করেছিল। ক্যাপ্টেন···এখন সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট দর্শকদের আসন থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "নেতাজীর ফরমোজা যাত্রার খবর অনুসরণের জন্য আপনাকে অভিবাদন

জানাচ্ছি। নেতাজীর জন্মদিনে খবরের কাগজে আপনার লেখা পড়লাম।"

"কিন্তু আপনি যাঁর বাণীটি আমার হাতে দিয়েছেন তাঁর কাছে এখনও আমি যেতে পারিনি।"

"চলুন, নিরিবিলিতে গিয়ে আমাদের টোকচাগুলো মিলিয়ে দেখি।"

টোগোর হিলের বেদীতে গিয়ে আমরা বসলাম।

দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ার উপর সূর্যোদয়ের দৃশ্য লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন···কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা আলগা পাথরের চাঁই নীচের দিকে গড়িয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "এটি কি সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দেওয়া হল?"

দূরে উন্মাদ আশ্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বললেন, "না। মনটা যেন ভারী হয়ে রয়েছে।"

"নাড়াচাড়া দিয়ে নিলেন?"

"ঠিক তা নয়। এটি হল আমার বিবেক সাফ করার প্রতীক পন্থা।"

"কিসে আপনার বিবেক দংশন করছে?"

"বোঝানো শক্ত। আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্যের শেষ নেই।"

তাঁকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসে বললাম, "চিকমদের হারাতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"হুঁ। আমি সেই বাণীর পাঠোদ্ধার করছি। মনটা যখন খুব খারাপ লাগে তখনই বুঝতে পারি দাইরেনে বন্দী আমাদের সেই স্বদেশবাসীর অবস্থা। আমাদের থেকে তাঁর জ্বালা সহস্রগুণে বেশী। ঘরে বসে ভাগ্য সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করার আমাদের কী অধিকার আছে!"

* * * *

মাথার উপর দিয়ে একটা উড়ো জাহাজ চলে গেল। আমরা নীরব। দেখলাম ক্যাপ্টেন··· তখনও বিক্ষুব্ধ। সরকারী নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্টের একটা কপি দেখিয়ে বেশ ক্ষুব্ধভাবে বললেন—"ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা এই ঘোলাটে রিপোর্টের সঙ্গে আপনার বিবরণ মিলিয়ে দেখেছি। আমাদের রাজনীতিক নেতারা নেতাজীকে মৃত বলে ঘোষণা করে কী দুর্ভাগ্যজনক ভুল করেছেন তা স্পষ্টই আপনার বিবরণ থেকে বোঝা যায়।"

ক্যাপ্টেন···· আমাকে এমিলি জোলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নেতাজী সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে কতকগুলি স্পষ্ট গোঁজামিলের অভিযোগ করলেন তিনি। তাঁর সর্বশেষ অভিযোগ হল—"নেতাজী তদন্ত কমিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে 'নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে' ঘোষণা করে মানবিক বিচার বিবেচনার বিধি লঙ্ঘন করেছেন। কারণ দাইরেনে নেতাজী রাশিয়ানদের কবলে পড়েছেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতের চিকমদের বন্দিশালা থেকে ফেরার সময় আমি স্বয়ং যে সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে এসেছি সেটাই নেতাজী সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটন করে সুবিচার করার পক্ষে যথেষ্ট। সরকার আমার কোর্ট মার্শাল করতে পারেন। প্রমাণ হবে যে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর সম্মুখে নেতাজী যে সৌর্যের আদর্শকে মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—শুধু আমি নই—দুনিয়ার দরবার বলছে সে আজ বিগত দিনের ইতিহাস। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর বোধ করি জাতীয় জীবনে এত বড় বিচার প্রহসন আর ঘটেনি।"

"নেতাজী সম্পর্কে সত্য একদিন নিশ্চয় প্রকাশ পাবে।"

"সোজা পথে তা অসম্ভব। জাতির ইতিহাসে নেতাজীকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করে, ভারতের বিবেকের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য নেতাজী-আদর্শে অনুপ্রেরিত কিছু বীর এবং দেশপ্রেমিককে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

টেগোর হিলের বেদী থেকে আমরা নেমে এলাম। মাঝপথে

একটি বিরাট গাছের স্নিগ্ধ ছায়ার তলায় নিরিবিলিতে তৈরী একটি অট্টালিকা। পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ি[illegible]রী করেন। ক্যাপ্টেন··· আমাকে মনে করিয়ে দিলেন—"জ[illegible] গুরুদেব একদিন বলেছিলেন—একমাত্র সুভাষই ভারতের [illegible]প্তি ভঙ্গ করবে।"

॥ ১০ ॥

নেতাজী-প্রশ্নের পুনর্বিচার চাই

আমাদের যেসব অফিসাররা তিব্বতের চিকম বন্দিশালা থেকে ফিরে এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখেছি যে নেতাজী-সংক্রান্ত ফরমোজা সরকারের দলিল দস্তাবেজ এবং অন্যান্য প্রমাণগুলি একরকম প্রামাণ্য। ১৯৪৫ সাল থেকে রুশদের সাইবেরীয় বন্দী শিবিরে দিন কাটিয়েও অনেক ইউরোপীয়ান তাঁদের দেশে ফিরেছেন। এঁদের কাছ থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। একনজরে এগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিচার করলে রিপোর্টের গুরুত্ব নস্যাৎ হয়ে যায়। সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে যে রিপোর্টটা একেবারে অবাস্তর, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী একটা গন্দা (নোংরা) কাগজের সামিল। কখনও যদি এটা ধর্মাধিকরণের সমীপে পেশ করা হয় শাওনওয়াজের মুখের ওপরই এটা কৌতুককর হিসেবে উবে যাবে।

নেতাজী-সংক্রান্ত তদন্তের একমাত্র প্রামাণ্য অকুস্থান হল ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জে তাইপে। সেখানে আজও এমন অনেক প্রত্যক্ষ-দর্শীর সন্ধান মিলবে যাঁরা ১৯৪৫ সালের সেই রটানো বিমান দুর্ঘটনার পরেও নেতাজীকে দেখেছেন। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণে ফরমোজার শাসনভার চলে যায় জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেকের চীনা সাধারণতন্ত্রী সরকারের হাতে। ১৯৪৯-এর শরৎকাল পর্যন্ত চীনের মূলভূমি এই সরকারের অধীন ছিল। তাই, কেউ ভাবতে পারে না যে ফরমোজা সরকারের দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা না করে নেতাজী তদন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারে।

নেতাজী-প্রশ্নে জওহরলালজী যদি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতেন তাহলে সত্য উদ্ঘাটন করা খুবই সোজা হত। জওহরলালের

বই "পুরানো পত্রগুচ্ছ" হতে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর—কংগ্রেস দেশের শাসনভার গ্রহণের বহু আগেই—জেনারেলিজিমো চিয়াংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদে জওহরলালই সর্বপ্রথম জেনারেলিজিমোকে অভিনন্দন জানান। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নয়াদিল্লীর সাধারণতন্ত্রী চীন সরকারের কমিশনার মারফত জওহরলালজীর নিকট তারবার্তা পাঠিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারবার্তার তারিখ ১৯৪৫-এর ২২শে আগস্ট। দিল্লী বেতার কেন্দ্র তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ বাইরের দুনিয়াকে জানায় ২১শে আগস্ট।

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ এবং জওহরলাল-চিয়াং তার-বিনিময় একই দিনে খবরের কাগজে প্রকাশ হয়। জওহরলালজী যদি নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ যাচাই করার জন্য জেনারেলিজিমোকে ব্যক্তিগত অনুরোধ করতেন দুনিয়ায় এমন কেউ ছিল না তাঁকে রুখতে পারে। কারণ ভারতে অনেকে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেননি। সত্য নিরূপণ করা দূরের কথা, ভারতের অবিসংবাদী নেতৃত্বের পদে আরোহণ করে জওহরলাল নিজেই নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেছেন এবং দেশবাসীকেও বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন।

জওহরলাল-সুভাষ পত্রাবলীর সর্বশেষ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে সুভাষের প্রতি নেহরুর একটা বিমনা ভাব ফুটে উঠেছে। ১৯৩৯-এর ২৮শে মার্চ সুভাষ জওহরলালের কাছে গুরুতর অভিযোগের সুরে লিখছেন—"আপনি এটা বুঝতে চান না যে আপনি ইচ্ছা করেন যে কোন প্রশ্নে ব্যক্তি-বিশেষ জড়িয়ে পড়লে আমরা সেটা যেন ভুলে যাই। কিন্তু সুভাষ বসুর ক্ষেত্রে আপনি ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে মতবাদটাকে বড় করে ধরেন।"

সুভাষবাবুর কথাগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর মত মিলে গেছে। জনমতের চাপে সুভাষ বসুর মৃত্যুকাহিনী তদন্ত করান জওহরলাল। কিন্তু তাঁর বৈদেশিক নীতির উচ্চ আদর্শ এটিকে পরিহাসে পরিণত করে। এদিক

থেকে সুভাষবাবুর মতবাদ সুস্পষ্ট। তিনি জওহরলালকে লেখেন—"পররাষ্ট্রনীতি হবে বাস্তবধর্মী। প্রধানত জাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।...পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আপনার মতবাদ কি জানাবেন। ভাবালু আদর্শের পথে এবং সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেই পররাষ্ট্রনীতি সফল হয় না।"

দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার যে মতবাদ সুভাষবাবু রেখে গিয়েছেন তার বিপরীত পথ ধরলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে জওহরলালজী। সুভাষ জওহরলালকে লিখেছিলেন—"একদিকে জার্মানী এবং ইতালীর নিন্দা আর অপরদিকে বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।" ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জওহরলাল জার্মানী এবং আমেরিকাকে নিন্দা করেছেন কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে রাশিয়া এবং চীন সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। ফরমোজা সরকারের প্রতি তাঁর নীতিও সমর্থনযোগ্য নয়। সারা দুনিয়ার আর কোনো প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মত চিকমদের এত প্রশংসা করেননি।

জওহরলালজীর চীন-নীতির সর্বপ্রকার বলিদান হলেন সুভাষবাবু। কালের গতিতে এই চীনই ভারতের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের প্রতি থাবা বাড়িয়ে বসল।

* * * *

মাওসে তুং সরকার প্রতিষ্ঠার পরেই স্ট্যালিনের সঙ্গে মোলাকাত করতে গেলেন। উদ্দেশ্য—ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণের প্ল্যান পাকা করে নেওয়া। রুশ-চীন মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হল ভারত, জাপান এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। তাছাড়া, অন্তবর্তীকালীন চুক্তিতে দাইরেনের নিয়ন্ত্রণভার রুশদের হাতে দেওয়া হল। এই দাইরেনে নেতাজী আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের গোপনীয় নথিপত্র চিকমদের হাতে

পড়ে। তারা নেতাজী দাইরেনে রয়েছেন সন্ধান পেল। রুশ এবং চিকম,—উভয়ের কাছেই নেতাজী শত্রু। কারণ ভারতের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি হিটলার ও জাপানের সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু তারা তাঁর জীবননাশ করতে সাহস পায়নি। কারণ তারা মনে করে নেতাজীকে ক্রীড়নকভাবে রেখে ভারতের উপর তাদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মতলব হাসিল করতে পারবে।

ফরমোজা বিবরণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে নেহরুজী নেতাজীর দাইরেনে অবস্থানের সংবাদ নানকিংয়ের ভারতীয় সামরিক অ্যাটাসের মারফত পেয়েছিলেন। হস্তক্ষেপ করা বা নেতাজীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা দূরের কথা, তিনি সংবাদটা একেবারেই আমল দিলেন না। বরং চিকমদের প্রতি তাঁর ভাবালু আদর্শ এবং সাধু ইচ্ছার নীতি অনুসরণ করেন। এখানেই সব শেষ নয়। রুশ-চিকম গুপ্তচরচক্র ফরমোজা সম্পর্কে তাঁর অন্তর একটা তিক্ত অবজ্ঞায় ভরে দেবার জন্য নানান ফন্দিফিকির বের করে।

নয়াদিল্লীর চিকম দালালরা নেহরুজীকে বোঝায় যে, নেতাজী প্রসঙ্গ উত্থাপনের পেছনে মার্কিন-ফরমোজা মতলব হল চীনের বিপক্ষে তাঁকে উত্তেজিত করা। এজন্যই জওহরলাল একরোখাভাবে ধরে রইলেন যে নেতাজী মৃত। সরকারের মধ্যে এবং বাইরে নেহরুজী বাম-আদর্শবাদী সহচররা অবশেষে নেতাজীর অবদানকে মুছে ফেলে দিলেন।

এখানে জওহরলালকে লেখা এক চিঠিতে সুভাষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"অবশ্য, যদি আমি একটা বড়রকমের শয়তান হই, তাহলে জনতার সামনে আমার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া শুধু যে আপনার অধিকার তা নয়, আপনার কর্তব্যও বটে। কিন্তু সম্ভবত আপনি বুঝেছেন যে শয়তান হলেও…তার প্রতি অনুকম্পা রয়েছে জনতার। দেশের সেবায় তার অবদান আছে—শত বিপর্যয়ের মধ্যেও।"

নেতাজীর এই কথাগুলি সর্বদাই ভারতীয় গণমানসে প্রেরণা যোগাবে। যাঁরা আজ ক্ষমতাসীন তাঁদের নিকট দাবি জানাব যে, নেতাজী-প্রসঙ্গে পূর্ণ তদন্ত হোক।

দাইরেনে নেতাজীর অবস্থান সম্পর্কে মস্কোর কাছে অনুসন্ধান করা এমন কিছু অসাধ্য নয়। জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারের ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে দাইরেনে অবস্থানের জন্য নেতাজী অভারতীয় হয়ে গেছেন সাব্যস্ত করা যায় না।

ভারতে খুব স্বল্প লোকেই উপলব্ধি করতে পারেন যে একজন নির্বাসিত ব্যক্তিকে কি দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিন যাপন করতে হয়। আমাদের দেশে এমন হতভাগ্যের সংখ্যা খুবই কম। অবশ্য আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার অভিজ্ঞতা আছে সেই দুঃস্বপ্নময় রাত্রির। আমাদের যে সব সহযোগী ক্ষমতায় আসীন, তাঁরা বাস্তবে অনভিজ্ঞ বলেই তাচ্ছিল্যসহকারে প্রশ্ন করেন—"দাইরেনে যদি নেতাজী জীবিত ছিলেন তাহলে তিনি ভারতে ফেরেননি কেন? রাশিয়ানরা আর যাই হোক, আমাদের বন্ধু।"

এর জবাব—"ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতাই একমাত্র সাক্ষী। রাশিয়ার লৌহ-বর্ম ভেদ করে খুব কম ভাগ্যবানই সূর্যের আলোকে পেঁছতে পেরেছে। নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা দূরের কথা, এমন কি ভারত তাঁর সামান্য খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।"

* * * *

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার অন্য দেশ অনুরূপক্ষেত্রে তার অধিবাসীদের ফিরিয়ে আনার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হলেন নেতাজী এবং আরও জন কয়েক। জার্মানদের সমস্যা খুবই বিরাট। প্রায় দশ লাখ অধিবাসীর ভাগ্য জড়িত। জনমতের চাপে চ্যান্সেলর আদেন্যুর স্ট্যালিনের সঙ্গে মোলাকাত করে রুশ-পিঞ্জর থেকে একজন দুজন নয় কয়েক শত-সহস্র

জার্মানকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও কয়েক শত-সহস্র।

রাশিয়ার কাছে নেতাজীর সম্পর্কে খবর দেওয়া আমাদের কেতাবী আগ্রহের সামিল করলে চলবে না। আদেন্যুরের মত আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ায় প্রেরণ করা হবে না কেন? নেতাজীর ভ্রমহীন নির্দেশ অনুসরণের প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত: পররাষ্ট্রনীতি হবে বাস্তবধর্মী। জাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখাই হল মৌল পররাষ্ট্রনীতি।

নেহরুজীর নীতি যেখানে ফলদায়ক হয়নি, সেখানে হয়তো নেতাজী-প্রদর্শিত নীতি ফলপ্রসূ হতে পারে।

॥ ১১ ॥

বৃটিশ গোয়েন্দাচক্র নাজেহাল

(১)

সুভাষ স্বদেশী জাতীয়তাবাদের যুগ-সন্তান। দেশে তখন সন্ত্রাসবাদের জোয়ার। যৌবনে সুভাষ বিপ্লবপন্থীদের দলে যোগদান করেন। একমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যেই ভারত থেকে বৃটিশদের হটানো যাবে, এই ছিল তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়। এজন্য তাঁরা অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন এবং বোমাও বানিয়েছেন।

কলেজ জীবনে সুভাষ একজন ইংরেজ লেকচারারের জাতিবিদ্বেষের কোপে পড়েন। তাঁর মাতৃভূমির প্রতি অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সুভাষকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই থেকেই সুভাষের অদম্য জীবন-পণ হল বৃটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশের শৃঙ্খল মোচন করা।

১৯১৯ সাল। জেনারেল ডায়ার হুকুম দিলেন। ১৬০০ নিরস্ত্র, নিরপরাধ ভারতবাসী খুন হলেন। প্রতিবাদে সুভাষই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করলেন। অগ্রজ শরৎ বসুকে তিনি লিখলেন—"হয় এই পূতিময় চাকরির মোহ ত্যাগ করে দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করব নয়ত আমার আদর্শ জীবনের ধ্রুবতারাকে বিদায় জানাব।"

এই সঙ্কল্পের পথে সুভাষের জীবন-লক্ষ্য পরিচালিত হল। বৃটিশদের সঙ্গে কখনও কোনরকম আপসে সুভাষ নারাজ। বৃটিশদের পক্ষেও সুভাষের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসহনীয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক জনসভায় গান্ধীজীকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সারা কংগ্রেস আন্দোলনে একমাত্র বৃটিশ-বিরোধিতায় দৃঢ়চেতা নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নিঃসন্দেহে বৃটিশদের সঙ্গে

সংগ্রামের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখার আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সুভাষই ছিলেন পুরোবর্তী।

(২)

দুর্দম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র তাঁকে হত্যা করার জন্য বৃটিশদের বহু সুযোগ দিয়েছেন। বৃটিশরা সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। কারণ তারা জানত সুভাষচন্দ্র তাদের প্রধান শত্রু হলেও তাঁকে শহীদ হবার সুযোগ দিলে আরও আগে বৃটিশদের ভারত থেকে পাততাড়ি গুটোতে হত। সুভাষের জীবনের কোন মুল্যই ছিল না, যদি তিনি তাঁর আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংগ্রাম না করতেন। ১৯৪০ সালের ২৬শে নবেম্বর তিনি বাংলার গবর্ণরকে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে তাঁর যে "রাজনৈতিক আদর্শ" ব্যক্ত করেছেন তাতে তিনি চিরবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লেখেন—"যন্ত্রণা ভোগ এবং ত্যাগের পথেই সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে যায়। এবং সর্বযুগে ও যে কোন পরিবেশে প্রকৃতির সেই চিরন্তনী নীতি অমর হয়ে থাকে—শহীদের রক্তেই গীর্জার ভিত্তি স্থাপিত হয়।"

"...একটি আদর্শ রক্ষায় একজন জীবন ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে হাজার হাজার প্রাণ।...আমার দেশবাসীর নিকটে আমার আবেদন...ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার অভিশাপ ভুলো না...সেই শাশ্বত বাণী মনে রেখো...প্রাণ লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

কারা-অন্তরাল থেকে এই চরমপত্রের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিলেন তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। কারার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে মৃত্যু বরণ করতে দিতে পারলে ইংরেজরা নিশ্চয়ই খুশী হতেন। কিন্তু তাঁদের সে সাহস হয়নি। ছদিন অনশনের পর সুভাষকে তাঁরা মুক্তি দিলেন।

জীবনভোর প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে নেতাজী তাঁর এই আদর্শ ত্যাগ করেননি।

তাঁর আদর্শ : "জাতীয় জীবনের মৌল সমস্যা সমাধানে আপনাকে আপনার সমসাময়িক নেতাদের অপেক্ষা বহু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে··· জনমানসে বাহবা লাভের জন্য যাঁরা স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দেন তাঁরা সাময়িক বীর যোদ্ধার আখ্যা পান কিন্তু ইতিহাসে তাঁদের স্থান হয় না।"

আমাদের অন্যান্য নেতা স্রোতের অনুকূলে গা ঢেলে দিয়েছিলেন—বিশেষ করে বৃটিশরা যখন বিগত মহাযুদ্ধে জড়িত হয়। সেই জন্যই বৃটিশরা তাঁদের চাইলেন। ইতিহাস থেকে সুভাষচন্দ্রের নাম মুছে দেবার জন্য বৃটিশরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

(৩)

নেতাজী যখন দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্রহ্ম-সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে বৃটিশদের প্রতি আঘাত হানছেন, বৃটিশরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবলুপ্তির জন্য বহু ফন্দি-ফিকির খাটান। শ্রী এ কে মজুমদারের "অ্যাডভেণ্ট অব ইণ্ডিপেনডেন্স" পুস্তকে নেতাজী সম্পর্কে শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর একটি বিবরণে আমরা দেখতে পাই—"নেতাজী প্রসঙ্গে বলতে পারি যে ১৯৩৮ সালে তিনি নাথালাল জাভেরীর সঙ্গে বেশ কয়েকমাস বসবাস করেছেন। হেতু, অসুস্থতা। দু' তিনবার তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। উদ্দেশ্য : তাঁর কোন কাজে আমি আসতে পারি কি না জানা। প্রকৃতই তিনি অসুস্থ ছিলেন না। জনশ্রুতি, তিনি সে সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন এবং এমন কি ছদ্মবেশে নিজে বাইরে গিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করেছেন।"

"গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজী ও সরদারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জানত।

প্রায়ই সকারের গোপন বার্তা গান্ধীজীর কাছে হাজির করতে হয়েছে আমাকে। এমনি একবার বৃটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট দেখানো হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কলকাতার জার্মান কন্সালের সঙ্গে নেতাজীর আলাপ-আলোচনা হয়েছে যে, যুদ্ধ লাগলে বৃটিশ বিরোধিতার কাজে জার্মানরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারেন। গান্ধীজীর কাছে আমি এই সংবাদ বহন করে নিয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য গান্ধীজী এই খবরে বিস্ময় বোধ করেন।"

তাঁর পুস্তকে শ্রীমজুমদার আরও লিখেছেন—"১৯৩৮ সালে কলকাতার জার্মান কন্সাল যে সাঙ্কেতিক সংবাদ জার্মানীতে পাঠান তা বৃটিশ গোয়েন্দা জানতে পারে। তারা ভারত-সরকারকে এবিষয়ে অবহিত করে। সরকার গান্ধীজীকে অবহিত করেন মুন্সীর মারফত। নেতাজীর গোপন কার্যকলাপে গান্ধীজী বিস্মিত হন। তিনি ঠিক করলেন কংগ্রেস সভাপতির আসনে নেতাজীকে পুনর্বিবেচিত করা হবে না। তিনি নেতাজীর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেতাজী কংগ্রেস সভাপতি পদে বৃত হলে গান্ধীজী তাঁর সহোযোগিতা করলেন না। ফলে নেতাজী ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন।"

এই কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ কিভাবে গান্ধীজীকে ভুল পথে চালিত করেছে এবং নেতাজী সম্পর্কে তাঁর মন বিষিয়ে দিয়েছে। বৃটিশদের এই চাল থেকে খুব সহজেই ধরা যায় যে তারা গান্ধীজীর হাত দিয়েই সুভাষের রাজনৈতিক জীবন অবলুপ্তির মতলব হাসিল করে নেয়। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন যদি শেষ না হয়ে থাকে, সে গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও হয়-নি। এটা সুস্পষ্ট যে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ গণমানসে সুভাষচন্দ্রকে জার্মান গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে হেয় করানোর উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করে এই কাহিনী রটায়। সুভাষের বিরুদ্ধে এই অবিশ্বাস্য অভিযোগ সম্পর্কে গান্ধীজী নিজে কোনও খোঁজ-খবর নিয়েছেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত আদর্শ

সুস্পষ্টভাবে সারা ভারতে সর্ববিদিত কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দাচক্র যে গান্ধীজীকে সম্মোহিত করেছে তার প্রমাণ এখানে মেলে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতের একজন অন্যতম ইতিহাসস্রষ্টা এবং গণমানসে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিরূপে বিদিত হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তি-প্রকাশ বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ছাড়পত্রের অপেক্ষা রাখে না।

বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের অভিযোগ বিদ্বেষপ্রসূত এবং আজগুবি জেনেও গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্মীরা সুভাষচন্দ্রকে গণমানসে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে এটা লাগালেন। ফলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং দেশ থেকে অন্তর্ধান করেন। সুভাষচন্দ্রের পরাজয়ে ব্রিটিশরা নিঃসন্দেহে বিজয়োল্লাস উপলব্ধি করেছিল। যদি কোনদিন প্রকাশ পায় যে, সুভাষচন্দ্রের সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরমোজায় অনুসন্ধানে জওহরলালজীর রাজী না হবার পিছনে বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি হয়েছে তাতে আমাদের আশ্চর্যবোধের কিছু নেই।

ফরমোজায় এখনও অনেক জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের গোয়েন্দা কর্মচারী জীবিত আছেন যাঁরা যুদ্ধকালে বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন। ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বৃটিশরা তাইপেতে সেই বিমানটিকে ভূপাতিত করার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু নেতাজীর সুপ্রসন্ন ভাগ্য তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছে।

(৪)

সংগ্রামের আদর্শবোধ এবং এতে জীবন বিপন্ন হতে পারে নেতাজী সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শ্রীমুন্সীর মারফত বৃটিশ গোয়েন্দাচক্র গান্ধীজীর কান ভাঙিয়েছে কিন্তু নেতাজী কোনদিনই রিভলবার, বোমা বা গুপ্তচরবৃত্তির সাহায্যে দেশের শৃঙ্খলা মোচনে বিশ্বাসী ছিলেন না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি জনসভায় নেতাজী

তাঁর যৌবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এক ভাষণে বলেন—"আমাদের চিন্তা ছিল কি করা যায়, নতুন কোন্ পন্থা অনুসরণ করা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের যুবকরা বোমা এবং রিভলবারের সাহায্য নিল। এসব বিপ্লবীদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। প্রকৃতই তারা উচ্চ আদর্শবাদী বিপ্লবী কর্মী। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের পক্ষে তাঁদের শক্তি সামর্থ্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত ছিল।"

১৯২৭ সাল। ব্রহ্মের ইনসিন কারাগার থেকে তাঁর ভাইকে নেতাজী লিখেছিলেন—"আমি বেনিয়া নই। দর কষাকষি আমার পেশা নয়। কূটনীতির পিচ্ছিল পথ অনুসরণ করা আমার আদর্শ বিরোধী। একটি মতবাদই আমার পাথেয়। সেটি অনুসরণ করে চলব। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দর কষাকষির অভিনয় করে চলার নীতির প্রতি আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করি না…।"

"আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা লাভ এবং সত্যান্বেষণ। অন্ধকারের পরে যেমন দিনের আলো ফুটে বেরোয়, আমাদের উদ্দেশ্য সেভাবেই সফল হবে। আমাদের জীবননাশ হতে পারে, আমরা ধ্বংস হতে পারি কিন্তু অনড় অটল নিষ্ঠার পথে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য এটা ঠিক যে একমাত্র নিয়তিই স্থির করবে আমাদের মধ্যে কে জীবদ্দশায় আমাদের সংগ্রাম এবং প্রচেষ্টার ফললাভ প্রত্যক্ষ করবেন। আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে সেই নিয়ন্তার হাতে সব কিছু সঁপে দিতে পারলে আমি জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করব।"

তাঁর মহান আদর্শ প্রমাণিত করবে যে নেতাজী ছিলেন সব কিছু ফন্দিফিকিরবাজির ঊর্ধ্বে। বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের চক্রান্তকর অভিযোগের বহু ঊর্ধ্বে তিনি। এইসব হীনম্মন্যতাসম্পন্ন অভিযোগ বিশ্বাস করে এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে গান্ধীজী নেতাজীর প্রতি ঘোর অবিচার করেছেন।

সুভাচন্দ্রের বিপক্ষে জার্মান গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগের পিছনে বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের মতলব ছিল ভারতীয় গণজীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা নস্যাৎ করা। কারণ বৃটেন তখন বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৭০ সালে রামগড়ে 'আপোষবিরোধী সম্মেলনে' সুভাষবাবু দেশবাসীকে ভারতব্যাপী বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হবার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যপথে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ১৯৩২ সালের মত সংগ্রাম শিকেয় তুলে রাখা চলবে না। কিন্তু ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্রান্সের পতনের পর জওহরলালজী রাজেনবাবুকে লিখলেন, "আমার ধারণা, বিপন্ন বৃটেনের দুঃসময়ের সুযোগে ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরে স্বীধনতা লাভের প্রচেষ্টা করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ হবে।" লখনৌর একটি জনসভায় নেহরুজী এই উক্তির পুনরুল্লেখ করেন।

১৯৪০ সালের জুন মাস। ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলনে নেহরুজীর উক্তির প্রকাশ্য জবাব দিলেন নেতাজী। তিনি বলেন—"সাম্রাজ্য অথবা ভারতের সাহায্যে বৃটেনের বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা আমাদের আলোচনা না করাই ভাল। এই দুর্যোগে ভারতের সর্বপ্রথম কর্তব্য আত্মরক্ষার চিন্তা করা।···ভারতবাসীর কর্তব্য হল একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য বৃটেনকে আহ্বান জানানো।"

তাঁর এই বিবৃতির পরেই রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বৃটিশ শাসকরা সুভাষচন্দ্রকে ২রা জুলাই কারারুদ্ধ করলেন। সেখান থেকে তিনি লিখলেন—"পশুশক্তির সাহায্যে সরকার আমাকে কারা-অন্তরালে আটক রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার প্রত্যুত্তর: আমাকে মুক্তি দাও নয়ত আমি জীবন রাখব না—জীবন-মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আমার।"

ভারতের বৃটিশ সরকারের কাম্য ছিল সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু। কিন্তু তাদের এ ভয় ছিল সুভাষচন্দ্রকে শহীদের সম্মান দেবার অর্থ হল বৃটিশ শাসনের দ্রুত অবসান।

বলপূর্বক আহার গ্রহণের প্রচেষ্টা বিফল হলে সুভাষচন্দ্রকে কারা-মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কড়া পাহারাধীনে তাঁকে তাঁর কলকাতার এলগিন রোড ভবনে অন্তরীণ রাখা হল। ১৭ই জানুয়ারী প্রত্যূষে সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ি থেকে অন্তর্হিত হলেন। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী রাজদ্রোহিতার অপরাধে সুভাষচন্দ্রের বিচারের দিন ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে গৃহে পাওয়া যায়নি। সেদিনই সর্বপ্রথম এ সংবাদ পরিবেশন করল আনন্দবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড।

তাঁর অনুসরণে বৃটিশরা ব্যর্থ হল। আট সপ্তাহ পর ২৮শে মার্চ ১৯৪১ সাল বার্লিন থেকে 'নেতাজী'র অভিষেক সংবাদ প্রচার হয়। অবশ্য এ অভিষেক হল সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারত থেকে বৃটিশদের হটানোর নেতৃত্ব গ্রহণের।

॥ ১২ ॥

বৃটেনের সঙ্গে নেতাজীর যুদ্ধ

(১)

১৯৪৭ সাল। বছরের গোড়ার দিকে আমি যখন বার্লিনে পেঁ ৗছলাম তখন আমার মানসপটে যে স্মৃতি ভেসে উঠল, সেটা হল সুভাষবাবুর সেই অবয়ব—যেমনটি তাঁকে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি দেখেছিলাম। ছবির পর্দায় যেমন বাছাইকরা সংবাদচিত্র দেখানো হয়, তেমনি আমার মানস-নয়নে বেছে নিলাম আমার সচিত্র কর্মধারা। সে দিনগুলিতে তাঁর সেই আহ্বান আমাদের অন্তরে দাগ কেটে দিয়েছিল—"স্বাধীনতার মুল্য—ক্লেশ এবং ত্যাগ। মুক্তির জন্য রক্ত-পণে সমর্থ ভারত। পরাধীনতায় আর্ত ৩৫ কোটি মানবাত্মা মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।"

কুর্ফ্যুরস্ট্যানডাম এবং উহ্ল্যাণ্ডস্ট্র্যাসের মোড়ে পেঁ ৗছে দেখলাম সেই ছোট্ট ভারতীয়-পরিচালিত রেস্তোরাঁটি বোমায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখানেই সুভাষ ঘোষণা করেছিলেন—"বৃটেন আমাদের ঐতিহ্যগত শত্রু। তার সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করব। অপর কোন শক্তির সমর্থন পাই আর না পাই, কিছু যায় আসে না।" ঐ দিনেই তিনি হিটলারকে প্রশ্ন করেন—বৃটেনকে কবে আঘাত করছেন? জানলে, আমরা একই সময়ে তার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে পারি। সেই অবধি জার্মানদের অন্তরে ভারতের যে কোন রাজনীতিকদের অপেক্ষা সুভাষের স্থান বহু উচ্চে, এমন কি গান্ধীজী বা নেহরুজীর চেয়েও।

বার্লিন পেঁ ৗছে আমার প্রথম কাজ হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রাক্তন জার্মান সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধের সময় তাদের কয়েকজন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল,

দু-একজন তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছে। রুডি তাদের একজন। তাকে আমার জীপ চালক করে নিলাম। জার্মানির চার প্রান্তে ঘুরে বেড়ালাম—বিশেষ করে জার্মান এবং জাপানীদের আত্ম-সমর্পণের পর নেতাজী এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের কি ঘটল, সে সম্পর্কে প্রাথমিক খোঁজ খবর নেবার জন্য।

(২)

ইউরোপের বহু নগরীতে—বিশেষত, বার্লিন রোম এবং ভিয়েনায় নেতাজীর পদ-ছায়ার সন্ধান পেলাম। প্রত্যক্ষ করলাম, সর্বত্রই তাঁর সম্পর্কে একটা উদ্দীপক ঔৎসুক্য বর্তমান। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতজনরা সেই বানানো বিমান দুর্ঘটনা এবং তাইপেতে তাঁর মৃত্যুর ইতিকথায় আদৌ আমল দিতে চান না। ইউরোপের বিভিন্ন জাতের লোকজন যাঁরা রাশিয়ার হাতে যুদ্ধবন্দী হন এবং তখন সবেমাত্র মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরছেন তাঁদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলি হল খাঁটি এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। ইয়াকুটস্কের মত যে ক'জন দুর্লভ ব্যক্তি সাইবেরীয় বন্দীশিবিরে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই সবচেয়ে খাঁটি খবর পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়ার হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে তখনও সুদূর প্রাচ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের নৈরাশ্যময় জীবন সম্পর্কে আমি এই ভাবেই যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

ধাপে ধাপে এইভাবে নেতাজীর ইউরোপীয় এবং দূরপ্রাচ্য ওডিশির পটভূমি রচিত হয়েছে। ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে ইঙ্গ-ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র যে কাহিনী প্রচার করা সমীচীন বোধ করেছিল তা থেকে এ চিত্রটি নিঃসন্দেহে ভিন্ন। বৃটিশ সমাচারে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় মুক্তিসেনা গঠন করে নেতাজী হিটলারের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন, এবং জার্মান সেনাবাহিনীর আদেশে তাঁর মুক্তিফৌজ পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়। বৃটিশদের আরও

গোঁসার কারণ হল তারা খবর পায় যে নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীরা জার্মানদের কাছ থেকে বেতন নিয়েছেন।

একদিন রুডি আমাকে প্রাক্তন জার্মান চান্সেলরিতে নিয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এটি হিটলারের দপ্তর ছিল। বোমা এবং রাশিয়ান কামানের গোলায় অট্টালিকাটি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিটলার-বাঙ্কার বলে অভিহিত চ্যান্সেলরির বোমানিরোধক আশ্রয়স্থানটি পরিদর্শনের জন্য রুডির একজন প্রাক্তন সহকর্মী আমাদের কাছে হাজির হল। সে প্রাক্তন জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের কর্মী। সে আমাকে বেশ কিছু কাগজপত্র দিল এবং তাছাড়া যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় সামরিক মিশন ভারতীয়দের সম্পর্কে যেসব নথিপত্র রাখেন তার কতকগুলি ফোটোস্ট্যাট্ কপি তার কাছ থেকে পেলাম। এসব কাগজপত্র থেকে আমার মনের সকল সন্দেহ নিরসন হল যে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছাকৃতভাবে নেতাজীর যুদ্ধকালীন কার্যকলাপের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে এবং রাশিয়ানদের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে জঘন্যতম শত্রুর মত আচরণ করেছে। প্রামাণ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমি এসব তথ্য মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখেছি।

(৩)

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ নেতাজী যখন বার্লিনে পৌঁছলেন—দেখলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণায় ত্রিপক্ষীয় অনুমোদন লাভ করা তাঁর পূর্বপ্রত্যাশা অপেক্ষা আরও দুরূহ কাজ। কারণ, ১৯৪০ সালে হিটলার-স্টালিন গোপন মোলাকাতে বৃটেনের পতনের পর ভারতবর্ষকে রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের দিন পর্যন্ত নেতাজীকে প্রতীক্ষা করতে হল। এবং তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ নেতাজীর প্রস্তাবে হিটলার সম্মত হননি।

যুদ্ধক্ষেত্রের সদর দপ্তরে হিটলারের সঙ্গে নেতাজী সাক্ষাৎ করলেন ১৯৪২ সালের ২২শে মে হিটলার নেতাজীকে দেওয়ালের মানচিত্রের নিকট নিয়ে গেলেন। জার্মানী থেকে ভারতের দূরত্বের দিকে দেখিয়ে হিটলার তাঁকে বলেন—"বাস্তব চিত্র দেখুন অপর্যাপ্ত অস্ত্রসজ্জিত হলেও কয়েক হাজার বৃটিশ সৈন্য কোটি কোটি নিরস্ত্র ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ন্ত্রিত করছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না যতদিন না কোন বাইরের শক্তি ভারতের প্রান্তে আঘাত হানে। জার্মানীর এখনও সেই শক্তি হয়নি।"

নেতাজীর জীবনে এমন ঘোর নৈরাশ্য কখনও ঘটেনি। কী দারুণ আঘাত তিনি পেয়েছিলেন হিটলারের এই উক্তিতে তার একমাত্র জীবিত সাক্ষী হলেন শ্রীমতী শেঙ্কল। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন।

তারপর জাপানের আমন্ত্রণে নেতাজী তাঁর কর্মতৎপরতা দূরপ্রাচ্যের দিকে স্থির করলেন। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে নেতাজীর প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় সমর্থন জানিয়ে জাপান বার্তা পাঠাল তাঁর কাছে।

নেতাজীর ছিল অনমনীয় অন্তর এবং কর্মশক্তি। তাঁর স্বাধীন ভারতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হল ১৯৪২-এর জানুয়ারীতে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকেই আজাদ হিন্দ রেডিওতে খবর বলা শুরু হয়। তাঁর যুদ্ধ-ধ্বনি—জয় হিন্দ।

সিঙ্গাপুর পতনে নেতাজী আরও উৎসাহিত হলেন। তিন ব্যাটালিয়ান সৈন্যের একটি ভারতীয় মুক্তিফৌজ এবং এক কোম্পানী অনিয়মিত সৈন্যদল গঠনের সিদ্ধান্ত করলেন নেতাজী। জার্মানী থেকে পৌঁছবার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে নেতাজী ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের প্রথমেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

নেতাজীর সাফল্যে বৃটিশদের ক্রোধের সীমা অতিক্রান্ত হল। নেতাজীর বিপক্ষে তাদের রেডিও এবং প্রচার যন্ত্র পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

তাদের জঘন্যতম কুৎসা রটনার লক্ষ্য হলেন তিনি। তিনি হিটলারী পন্থার অনুসরণকারী এবং হিটলারের ক্রীড়নক বলে রটনা হল।

নেতাজী ওজস্বী ঘোষণা করলেন—"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমার জীবন একটি দীর্ঘ, অবিরত আপোষবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত। এখানেই—আমার কর্তব্যনিষ্ঠার সর্বোত্তম পরিচিতি। আমি অক্ষশক্তির সমর্থনে কিছু বলার প্রয়াসী নই। ভারত এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমার কর্তব্য সমাধা হলেই আমি স্বদেশে ফিরব।"

মুক্তিসেনার উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করেছেন—"অস্ত্র সাহায্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করব। স্বাধীনতা কখনও দান করা যায় না। অর্জন করতে হয়।"

ভারতীয় মুক্তিসেনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মধ্যে অথবা প্রান্তে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মুক্তি-সেনাকে শিক্ষিত করা হয়। মুক্তিফৌজকে "স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী" আখ্যা দিয়ে নেতাজী ঠিকই করেছেন। এই বাহিনীর প্রত্যেক লোককে তিনি অন্তরের নিবিড়তম অনুভূতি মাখিয়ে একটি করে ফুল উপহার দেন।

নেতাজীর সংগঠন বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশনের সমমর্যাদা লাভ করে। তাঁর সেনাবাহিনী এবং সংগঠনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা তিনি জার্মানীর কাছ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে জার্মানীর অর্থ পরিশোধ করা হবে।

বৃটিশ অভিযোগের মূল হল তাঁর সাফল্যে তাদের ঈর্ষা। লণ্ডনে অস্থায়ী ফরাসী সরকার প্রতিষ্ঠা, সৈন্যবাহিনী এবং সরকার পরিচালনাব্যয় নির্বাহের যদি জেনারেল দ্যগলের পক্ষে বৃটিশের অর্থগ্রহণ মর্যাদাপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে জার্মানদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে নেতাজীও মর্যাদাপূর্ণ কাজ করেছেন। ব্যতিক্রম

হল, বিজয়ী হয়ে জেনারেল ত্যগল ফ্রান্সে ফিরেছেন আর নেতাজীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে।

ফললাভের তফাতটুকুর জন্য নেতাজীর ঐতিহাসিক সাফল্যকে ছোট করে দেখা চলে না। বরং তাঁর বিরাট নেতৃত্ব ছাড়াও তাঁর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মানবিকতার পথে আন্দোলন পরিচালনার কাছে জেনারেল ত্যগলের নিয়ম-ধরা নেতৃত্ব ম্লান হয়ে যায়।

নেতাজী তাঁর অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—"স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তোমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে। পবিত্র সংগ্রামে প্রত্যেক শহীদের জন্য দেশে একটি করে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত হবে। ভারত-পথে অগ্রসর হবার সময় সেনাবাহিনী আমি পরিচালনা করব।"

(৪)

সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নেতাজী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের উপর বৃটিশ ব্যূহদ্বার হল সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং কলকাতা। জাপানীদের হাতে সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনের পতন হল। স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিচালনা করে কলকাতায় প্রবেশ করার পরিকল্পনা রচনা করলেন নেতাজী।

রবার্ট ক্লাইভের যুগ থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভিত্তির ওপর এত প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়নি। সেদিন আজ অতীত, যখন বৃটিশ শক্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে ক্রীতদাসসুলভ বশ্যতা এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এশিয়ার আকাশে স্বাধীনতার আলোকসম্পাত করেছেন নেতাজী।

১৯৪৩ সালের সূচনায় নেতাজীর মনে প্রধান চিন্তা হল—"দেশের শাসনভার কি ভাবে গ্রহণ করা যায়, তার সমস্যা। ইংরেজরা যখন ভারত ত্যাগে উদ্যত, তখন স্বাধীনতা ভিক্ষা বা অপর শক্তির কাছ

থেকে স্বাধীনতা দানস্বরূপ গ্রহণ করা অর্থহীন। কারণ এমন স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না…।"

এশিয়ার রণাঙ্গনে অপ্রত্যাশিত অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণের জন্য নেতাজী কিয়েল থেকে একটা জার্মান সাবমেরিনে রওনা হলেন ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী। আটলান্টিকে দীর্ঘ পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে মাদাগাস্কারের ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনি পৌঁছলেন। সেখান থেকে একটা জাপানী সাবমেরিনে (১-২৯) তিনি আরোহণ করলেন ভারত মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্য ২৮শে এপ্রিল। সুমাত্রার উত্তরখণ্ড সাবাং-য়ে তিনি অবতরণ করলেন। এবং সেখান থেকে টোকিও পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালের ১৩ই জুন, দীর্ঘ আঠারো সপ্তাহব্যাপী যাত্রার পর। মুহূর্তের জন্য কালক্ষেপ না করে নেতাজী সামরিক তৎপরতায় নিযুক্ত হলেন। ছ'সপ্তাহের মধ্যেই তিনি প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যেও বাংলা দেশে যখন ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তিনি সর্বতোভাবে বাংলার সাহায্যের জন্য চিন্তা করলেন। আগস্ট মাসের মধ্যেই ভারতীয় লীগের কাছ থেকে এক লাখ টন চাল সংগ্রহ করে জাহাজযোগে কলকাতায় পাঠানোর ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। বেদনা-বোধহীন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বৃটিশরা তাঁর দান প্রত্যাখ্যান করল। নেতাজীর নিজের প্রদেশ—বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল। নেতাজীর প্রতি সহানুভূতির জন্য বৃটিশরা এভাবে প্রতিশোধ নিল।

হতাশায় মুষড়ে না পড়ে সামরিক তৎপরতার দিকে নেতাজী মনপ্রাণ সন্নিবিষ্ট করলেন। দূরদর্শী সমরনায়ক হিসাবে নেতাজী ঘোষণা করলেন—"জাপানী রক্তে ভারতের মুক্তি ক্রীতদাসত্ব অপেক্ষাও ঘৃণ্য।" সর্বাধিক পরিমাণ রক্তদান এবং সর্ববিধ ত্যাগই ভারতের

জাতীয় সম্মানের দ্যোতক। এই আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে নির্দেশ দিলেন আসন্ন ইম্ফল অভিযানে পুরোভাগ গ্রহণের জন্য। ১৯৪৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। মালয়ের এক ভাষণে তিনি জানালেন—"ভারত-সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের উপস্থিতিই জনসাধারণ এবং ভারতীয় বাহিনীর প্রতি মুক্তির উদাত্ত আহ্বান হিসাবে গণ্য হবে।"

নেতাজী এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন যে, নিজে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর গ্রহণ করে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। সাধারণ অভিবাদন এবং যুদ্ধধ্বনি—জয় হিন্দ্ সহ ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা জাতীয় পতাকা নির্দিষ্ট হল।

অস্থায়ী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষশক্তি এবং তাদের সমর্থক সরকারসমূহের স্বীকৃতি লাভ করে। অস্থায়ী সরকারের পতাকাতলে দূরপ্রাচ্যের ভারতীয়দের সকল সম্পদ—ধন জন নিয়োজিত হল যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য। জাপানীদের নিকট থেকে নেতাজী একমাত্র জাপ অধিকৃত ভারতীয় এলাকা—আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যর্পণ দাবি করলেন। তাঁর এই দাবি জাপানীরা পূরণ করে। জাপানীদের নিকট থেকে তিনি আরও প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, ভবিষ্যতে যেসব ভারতীয় অঞ্চল জাপানীদের দখলে আসবে সেগুলির শাসন-কর্তৃত্ব ন্যস্ত হবে তাঁর সরকারের হাতে।

অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নূতন নামকরণ হল শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ—১৯৪৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর। নেতাজী অবতরণ করলেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে। ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অন্ধকার প্রকোষ্ঠময় কারাগার পরিদর্শনে যান। এখানে তাঁর বেশ কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহযোগী নির্যাতিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেছেন। জনগণের প্রকৃত মুক্তিদাতা হিসাবে ইতিহাস যথার্থই তাঁর বাণীর স্বীকৃতি দিয়েছে—"ভারত মুক্তি পাবে এবং অচিরেই।" এবং স্বাধীন ভারত কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে, যাতে তার সুযোগ্য সন্তানেরা অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের বাইরে এসে স্বাধীনতা, আনন্দ এবং স্বয়ম্ভরতার আলোক দেখতে পায়।

দুটি মৌল ঐতিহাসিক কর্তব্যের আহ্বান নেতাজী এবং তাঁর মুক্তিফৌজের উপর বর্তে। যথা—মাতৃভূমির মূল ভূখণ্ডের স্বাধীনতা-লাভের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের পর মুক্তি ফৌজকে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রূপান্তর করা।

টোকিওতে তিনি ঘোষণা করেন—"ভারতের পক্ষে অন্য কোন পন্থা নেই···বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষবিরোধী সংগ্রাম ছাড়া। যদিও অপর কোন জাতির পক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে আপোষরফা সম্ভব হয়, ভারতের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর। বৃটেনের সঙ্গে আপোষ-রফা অর্থ কৃতদাসত্ব। এবং আমরা সংকল্পবদ্ধ যে, দাসত্বের সঙ্গে আর কোন মীমাংসা নেই।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দূরপ্রাচ্যের অপরাপর সামরিক তৎপরতার সমষ্টিগত বিশ্লেষণমূলক বিচারে প্রত্যয় হবে যে বৃটেনের সঙ্গে নেতাজীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাস্তব তাৎপর্যময় এবং তার ব্যাপ্তি সুদূর-প্রসারী। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের ভাগ্যচক্রের গতি পরিবর্তিত করে অন্ধকারময় ক্রীতদাসত্বের জীবন থেকে রবিকরোজ্জ্বল স্বাধীনতায়। এবং সারা এশিয়ার পট পরিবর্তন হল।

॥ ১৩ ॥

নেতাজীর দাইরেন যাত্রার পটভূমি

নেতাজী মৌল নীতি হিসাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন "···ভারতের বৈদেশিক নীতির মুল আদর্শবোধ এই পথেই নির্দিষ্ট এবং এই সূত্র অনুসরণ করে চলবে যে—বৃটেনের শত্রু, ভারতের মিত্র।" ১৯৪৫ সালের ২১শে মে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁর ব্যাংকক বক্তৃতায় এবং সর্বকালে, সর্বত্রই তিনি এই নীতির পুনরভিব্যক্তি করেছেন।

তাঁর এই ঘোষণা অবশ্যই মস্কোর প্রতি আবেদনস্বরূপ। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী যখন ভারত ত্যাগ করেন, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া যাত্রা। এমন কি কাবুলে অবস্থান কালে তিনি রুশ-রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস করেন। কিন্তু তিনি বিফল হন। কাবুলের রাজপথে তিনি একদিন সোভিয়েট দূতের গাড়ি থামিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সেদিন ব্যক্ত করতে পারেননি। ভাষাই অন্তরায় হয়। আরও কয়েকবার রাশিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা তাঁর সফল হয়নি।

ইতালীয় ও জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। কাবুলে তাঁর কাছে তারা ওরল্যাণ্ডো মাসোটা নাম দিয়ে একটা পাসপোর্ট পাঠায় এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য একজন দূতও আসে। তিনি এই দূতের সঙ্গে রুশ সীমান্তের পথে যাত্রা করেন। সোভিয়েট এলাকা দিয়ে যাত্রাকালে তাঁদের কোথাও অবস্থানের অনুমতি ছিল না। এজন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করা বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করার সুযোগ পাননি। জার্মানীতে পৌঁছে নেতাজীকে প্রায়ই হতাশ হতে হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণায় হিটলার সম্মত হননি। নাৎসীদের রাশিয়া আক্রমণে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

কিন্তু জাপানী সামরিক অ্যাটাশে কর্ণেল ইয়ামামাতো নেতাজীর আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন। তা সত্ত্বেও তুরস্ক এবং রাশিয়ার মধ্য দিয়ে নেতাজীর জাপান যাত্রা ব্যবস্থার কোন সুরাহা করতে তিনি পারেননি। নেতাজীর পক্ষে সোভিয়েট দেশে পৌঁছে রুশ দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার মত আর কোনও পথ উন্মুক্ত রইল না।

এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সাধনের পথে খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে এই প্রত্যাশায় নেতাজী ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ভাগবত গীতার একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে নেতাজী বার্লিনে অবস্থান কালে মনস্থ করলেন…"কর্তব্য সম্পাদনেই আমি খুশী। ফল তাঁকেই সমর্পণ করলাম।"

* * * *

হিটলারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণা প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে বার্লিনে নেতাজী শ্রীনাম্বিয়ারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। শ্রীনাম্বিয়ার বার্লিন তথা মধ্য ইউরোপে বসবাস করছেন ১৯২৪ সাল থেকে। যুদ্ধের সময়ে তিনি বার্লিনেই ছিলেন।

নেতাজী যখন দূরপ্রাচ্যে রওনা হন, শ্রীনাম্বিয়ারকে ইউরোপে তাঁর ডেপুটিরূপে রেখে গেলেন। 'ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার' পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর নীতি রূপায়ণ এবং নির্দেশ পালনের ভার ন্যস্ত হল শ্রীনাম্বিয়ারের উপরে। জার্মানদের আত্মসমর্পণের পর ১৯৪৫ সালের ৮ই জুন ইণ্ডিয়ান সিকিউরিটি ইউনিট নামক একটি সংস্থার হাতে শ্রীনাম্বিয়ার গ্রেপ্তার হন। তারপর নেহরুর দিল্লী সরকারে যোগদানের পর এই ইণ্ডিয়ান সিকিউরিটি ইউনিট ভেঙে দেওয়া হয়। জার্মানীতে ভারতীয় বন্দীদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল বার্লিনে ভারতীয় সামরিক মিশনের হাতে।

১৯৪৭ সালে বার্লিনে এই সামরিক মিশনের কতকগুলি দলিল-দস্তাবেজ আমার হাতে আসে। জার্মানীতে ভারতীয় যুদ্ধ

বন্দীদের সম্পর্কে তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশনামা এই সব কাগজপত্র থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। নাম্বিয়ার প্রসঙ্গ নির্দেশনামার একটি উদাহরণ; যা থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে, সত্যান্বেষণে কী পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমন কি নেতাজী প্রসঙ্গেও এই অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য।

শ্রীনাম্বিয়ার জওহরলালজীর সুপরিচিত ব্যক্তি। বার্লিনে ভারতীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের শুরুতেই তিনি শ্রীনাম্বিয়ারকে সেখানকার প্রধানরূপে নিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালের শেষে জওহরলাল যখন প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন বার্লিনের ভারতীয় তথ্য কেন্দ্রের পরিচালনা ব্যয় বহনের জন্য কংগ্রেস অর্থ প্রদান করে। ইউরোপের যুদ্ধশেষে জার্মানীতে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কবল থেকে শ্রীনাম্বিয়ারকে মুক্ত করার জন্য জওহরলাল স্বয়ং যথেষ্ট ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদিও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় তাঁর স্ব-পরিচালনাধীন ছিল তবুও মন্ত্রণালয়ের বৃটিশ অনুরাগী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শ্রীনাম্বিয়ারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এটা বিস্ময়ের বিষয় যে, জওহরলালজীর স্ব-পরিচালনাধীন মন্ত্রণালয়ের ভারতীয় কর্মচারিগণ ভারতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বৃটিশ স্বার্থরক্ষায় অধিকতর আগ্রহশীল—তা প্রত্যক্ষ হয়েছে বিশেষ করে শ্রীনাম্বিয়ার প্রসঙ্গে। অতএব, আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, দিল্লীর এই একই প্রশাসনযন্ত্র নেতাজী প্রসঙ্গ পরিচালনা করেছেন। বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে তাদের মিল থাকবে সেটা স্বতঃসিদ্ধ।

বার্লিনের ভারতীয় সামরিক মিশনের নথিপত্রের যে সব আলোকচিত্র আমার কাছে রয়েছে তার মধ্যে আছে জওহরলালকে লেখা শ্রীনাম্বিয়ারের একটা চিঠি। তারিখ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬। চিঠিতে শ্রীনাম্বিয়ার অনুযোগ করেছেন—“এমন পরিস্থিতিতে জীবন স্বভাবতই নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। আমাকে নূতন করে জীবন শুরু

করতে হবে। স্বাস্থ্য এবং রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমার সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া দরকার।”

নাম্বিয়ার বলেছেন—“এমন পরিস্থিতিতে জীবন স্বভাবতই নিস্প্রভ মনে হচ্ছে।” এটা আসলে অনুযোগের সুরে অভিযোগ।

ভারতীয় সামরিক মিশনের জনৈক মেজর ওয়ারেনের একটা নোটের আলোকচিত্রে আমরা দেখতে পাই তিনি লিখছেন—“নাম্বিয়ার আদৌ খুশী নন। তিনি অনুরোধ করেছেন যে, হার্টফোর্ড জুভেনাইল জেলে, যেখানে তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বহু দিন কাটিয়েছেন সেখানেই তাঁকে পুনরায় অন্তরীণ রাখা হোক। তিনি বলেছেন যে বর্তমানে তাঁকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তাতে তাঁর পক্ষে জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা করা সম্ভব নয়।”

* * * *

বৃটিশ গোয়েন্দা এবং ভারতীয় সামরিক মিশনের হাতে যখন এমন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় এবং স্বয়ং জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই হাল হতে পারে তাহলে জার্মানীতে অপরাপর ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের কি দশা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এমন কি ১৯৪৭ সালে ভারতীয় সামরিক মিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বেশ কয়েকজন ভারতীয় প্রকাশ্য অভিযোগ করেছেন যে যুদ্ধের সময় নেতাজী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত “স্বাধীন ভারত কেন্দ্রে”র পক্ষে কাজ করার মত সামান্যতম অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এবং ভারতীয় সামরিক মিশনের লোকজন তাঁদের ওপর অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছেন।

আর একটা পত্রের বিষয়বস্তু হল “স্বদেশ প্রত্যাবর্তন”, এর আলোকচিত্রে দেখা যায় যে স্বাক্ষরকারী হলেন ভারতীয় সামরিক মিশনের জনৈক কর্ণেল। বার্লিনে আমি অবগত হই যে এই কর্ণেল একজন ভারতীয়। নাম্বিয়ার যখন খাদ্য এবং কয়লা রেশনের জন্য ভারতীয় সামরিক মিশনের সুপারিশের আবেদন জানান, কর্ণেল

প্রত্যুত্তরে লেখেন—"মিশনের যে কোন সুপারিশ পত্রে সরকারী বক্তব্যে অবশ্যই জানানো হবে স্বাধীন ভারত কেন্দ্রের সঙ্গে আপনার অতীত সংস্পর্শ এবং যুদ্ধের সময় আপনি জার্মানদের বেতনভুক ছিলেন।" যে সব ভারতীয়রা দেশের মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের ওপর বৃটিশ উষ্মার অভিব্যক্তিই পত্রটিতে ফুটে উঠেছে।

যাই হোক, নাম্বিয়ার ভাগ্যবান, নেহরু তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন: ভারতীয় সামরিক মিশনের ফাইলে নাম্বিয়ার প্রসঙ্গে ভারত সরকারের জনৈক আণ্ডার সেক্রেটারীর একটা পত্রে বলা হয়—আপনাকে অনুরোধ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনি ভারত সরকারের পক্ষে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং যাতে শ্রীনাম্বিয়ার সুইজারল্যাণ্ড যাবার অনুমতি পান সেজন্য আপনি যথাসাধ্য প্রয়াস করবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, তাঁর অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কিত নথিপত্রে দেখা যাবে যে তিনি জার্মানী, প্রাগ এবং প্যারীতে অবস্থান কালে পুরোপুরি নাৎসী-বিরোধী ছিলেন।

নেহরুর খোদ ইচ্ছাক্রমে সুস্পষ্ট সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও দেখা যাবে যে ইউরোপে নেহরুর একজন উচ্চ পদাধিকারী প্রতিনিধি—যিনি নিজেও ভারতীয়—জার্মানীর বৃটিশ অন্তরীণ থেকে নাম্বিয়ারের মুক্তির পথে নূতন বাধা সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে এই ব্যাপারটি থেকে প্রতীয়মান হবে যে সাধারণ নীতি হিসাবে নেহরুর আপন দপ্তরের অফিসারেরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী এবং তাঁর মহান আদর্শে যে সব ভারতীয়গণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের হয়রানি করার নীতি অনুসরণ করে ভারতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বৃটিশের প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

*　　*　　*　　*

আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রথম ক'বছরে গঙ্গার বহু জল নিম্ন স্রোতে এসেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি বৃটিশ প্রতিহিংসাপূর্ণ

প্রবৃত্তিও কালক্রমে প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ভারতীয় আমলাতন্ত্রের অন্তরে নেতাজী প্রসঙ্গে কোন পরিবর্তন এখনও প্রত্যক্ষ হয়নি।

সত্য হল—বার্লিনে অবস্থান কালে যতটুকু প্রমাণ সংগ্রহ করেছি—নেতাজী এবং ইউরোপে তাঁর ভারতীয় সহকর্মীরা অন্তরে নাৎসী-বিরোধী ছিলেন। এটা কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এবং বর্তমান ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারীরা উপলব্ধি করতে পারেননি। ১৯৩৬ সালে নেতাজী যখন হিটলারকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কবে বৃটেন আক্রমণ করছেন, প্রত্যুত্তরে নেতাজী শোনেন যে এমন কথা জার্মানদের চিন্তার অতীত। বরং তারা আশা করে যে, বৃটেনের সঙ্গে জার্মানদের একটা সমঝাওতা হবে। একমাত্র রাশিয়াকে বৃটেনের শত্রু এবং অতএব ভারতের মিত্ররূপে চিহ্নিত করা ছাড়া নেতাজীর পক্ষে আর বিকল্প পন্থা রইল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়—তখন মস্কোর সঙ্গে রাশিয়ানদের একটা আধা গোয়েন্দা সংস্থা যুক্ত ছিল। সেটা হল, কমিণ্টার্ণ। নাম্বিয়ারের মত বার্লিন প্রবাসী ভারতীয়গণ রুশ কমিণ্টার্ণভুক্ত ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। নেতাজীও কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযোগ রাখার কথা চিন্তা করেছিলেন। দেখা যাবে তাঁর দাইরেন যাত্রার পূর্বে তিনি নাম্বিয়ারকে নির্দেশ দেন যে রাশিয়ানরা ভারতীয় রাজনৈতিক শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে কিনা অনুসন্ধান করতে।

তাঁর নিজের প্রশ্নে নেতাজী রাশিয়ানদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগের জন্য জাপানীদের নিকট সর্বদা দাবী জানিয়েছেন। রেঙ্গুন এবং শ্যামদেশ অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজী সর্বদাই শেষ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইম্ফলের পরে রাশিয়া থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার কথা চিন্তা করেছেন তিনি।

কিন্তু নেতাজীকে জাপানীরা এ বিষয়ে কোন সরকারী প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি।

১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে টোকিওতে অবস্থান কালে রুশ কমিণ্টার্ণের টোকিও শাখার ভারতীয় সদস্যগণের সঙ্গে নেতাজীর গোপন দেখাসাক্ষাৎ হয়। জাপানীদের আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই কমিণ্টার্ণ একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নেতাজীর পক্ষে এমন একটা সুযোগ পাওয়ার আশা খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল।

স্থানীয় রুশ প্রতিনিধিদের বাজিয়ে দেখার প্রশ্নে নেতাজী খুব সতর্কতা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কমিণ্টার্ণের বিস্তৃত জালের সঙ্গে মস্কোর সদর দপ্তরের সম্পর্কের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। স্ট্যালিনের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন চাপে কাগজে পত্রে কমিণ্টার্ণের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হল। কিন্তু প্রকৃত খবর হল প্রেসিডিয়ামের প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক নেতাদের নেতৃত্বে একটা স্থায়ী 'লিকুইডেশন কমিশন' গঠন। রাশিয়ানদের আভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির গুপ্ত বৈদেশিক শাখাসমূহের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

নেতাজীর সম্মুখে দাইরেন যাত্রার সঙ্কল্প গ্রহণ করা ছাড়া আর বিকল্প পন্থা রইল না। তাই তিনি রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার বন্দর দাইরেনে যে কোন উপায়ে পৌঁছবার ঝুঁকি নিলেন, কারণ দাইরেন যাওয়ার অর্থ হল রাশিয়ানদের হাতে পড়া। যাই হোক, তারা রুশ, বৃটিশ নয় এটুকু নেতাজীর সন্তুষ্ট হবার পক্ষে যথেষ্ট।

অবশেষে নেতাজীর বার্লিন অনুগামীরা যখন রুশদের হাতে ধরা পড়েন এবং সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্কের মত তাঁদেরও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হল, তখন দূর প্রাচ্য থেকে নেতাজীর তরঙ্গায়িত প্রতিধ্বনি সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্ব বার্লিনেও স্পন্দন জাগালো।

॥ ১৪ ॥

ইয়াকুটস্‌ক্ বন্দিশালার ৪৫ নম্বর সেলে নেতাজী!

১৯৪৫ সাল, ২৬শে ফেব্রুয়ারি। ব্রহ্মদেশের মাউণ্ট পোপার পাদদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নেতাজী। অবিরাম কামানের গোলা এবং বোমার অগ্ন্যুদ্‌গিরণে উত্তর-পশ্চিম দিগন্ত রক্তিমাভ। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু বিমানে যেন আকাশ ছেয়ে গেছে। বৈমানিকদের প্রতি ঢালাও নির্দেশ দেওয়া আছে—"আজাদ হিন্দ ফৌজের শিরোমণি জাপানীদের ক্রীড়নক রাজদ্রোহী বোসকে পেলে হত্যা করবে।"

এহেন বিপদকেও নেতাজী তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঘৃণার সঙ্গে তিনি বলেছেন—"আমাকে হত্যা করার মত এমন একটা ইংল্যাণ্ড এখনও তৈরি করতে পারেনি।" তখন কিন্তু তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটছে। সামরিক পরিস্থিতি তার অনুকূলে নেই। আরও জটিল।

দশ মাস আগে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তাঁর বাহিনী ইম্ফলের সমতল ভূমিতে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ভারতের রেডিওকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন, "ভারত-বিরোধী রেডিও"। তাঁর এই নামকরণ খুবই সঙ্গত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রচারে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। বৃটিশদের নিকট চরম দাবি জানিয়ে তিনি দেশবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন—"বৃটিশরা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব মেনে নিয়ে কার্যকরী করুক। আমি আপনাদের নিকট শপথ করে বলছি, একটাও জাপানী সৈন্য ভারতের মাটিতে পদার্পণ করবে না।" এমন আন্তরিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বৃটিশ গোয়েন্দাদের জঘন্যতম "প্রচার-বোমা" নেতাজীর বিপক্ষে ভারতীয় গণচিত্তকে বিষিয়ে তুলেছিল। আমরা হলপ করে বলতে পারি না যে, এই বিষ-মাখানো প্রচারে নেতাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

কলঙ্কিত হয়নি। এবং একারণেই রাশিয়ার আশ্রয়ে তাঁকে দুর্ভোগ পেতে হয়েছে।

এশিয়ার সামরিক ইতিহাসে ইম্ফল যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওয়াটারলুর সমতুল। এ সত্যটি আমাদের ঐতিহাসিকরা এখনও উপলব্ধি করেননি। আমাদের এই অজ্ঞতার মূল কারণ হল—(১) নেতাজীর প্রাপ্য সম্মান প্রদানে আমাদের ব্যর্থতা; এবং (২) তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানে আমরা উদ্বেগহীন। বৃটিশ কামানের গোলায় নেতাজীর কিছু হয়নি। কিন্তু তাদের গোয়েন্দাচক্রের প্রচার-বোমা তাঁর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে।

বিপদসঙ্কুল জেনেও মাউণ্ট পোপার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীকে বাধ্য হয়ে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে হয়।

(২)

রাশিয়া পুনদর্শনের প্রচেষ্টায় ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের ভাগ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এমন সময় বার্লিনে সাক্ষাৎ পেলাম লালফৌজের কয়েকজন অফিসারের। একদা রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে এদের সঙ্গে আমি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। রাশিয়ান কন্সালের নিকট আমার সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনের জন্য ভিসার আবেদনে এঁরা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে সুপারিশ করেন। কিন্তু স্ট্যালিন-বেরিয়ার আসনাধীন রাশিয়ায় আমার পুনঃপ্রবেশের প্রশ্ন বিবেচনা হওয়া অসম্ভব বোধ হল।

খাস সোভিয়েট মূলুকে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে তাদের নব অধিকৃত পূর্ব ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের চারি প্রান্তে ভ্রমণ করেছি। একবার ওয়ারশতে গিয়ে হাজির হলাম। সোভিয়েট মার্শাল রকোস্‌ভস্কী তখন পোল্যাণ্ডের সামরিক শাসক। তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফে একজন অফিসারের সন্ধান পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় লেলিনগ্রাডে প্রাক্ যুদ্ধকালে। সত্যই একজন সাদাসিধে হৃদয়বান

রুশ এই অফিসারটি। পাকেচক্রে যে-সব বিদেশী রাশিয়ায় রাজনৈতিক শরণার্থীরূপে বাস করছেন, তাঁদের ওপর কম্যুনিস্টদের নির্যাতন করা তিনি ঘৃণা করতেন।

ইনি হলেন প্যাভ্‌লভ্‌। তাঁর সাহায্যে যে-সব রুশ অফিসার মস্কোর কমিণ্টার্ণের ভারতীয় শাখার সঙ্গে পূর্বে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আবার আলাপ করার সুযোগ পাই। ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে যারা নেতাজীর স্বাধীন ভারত কেন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু সংবাদ এঁরা আমাকে দেন। রুশদের চাপে পড়ে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরে আসতে পারলে কম্যুনিস্টদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্মত হয়। পূর্ব জার্মানীর লিপ্‌জিগে এশীয় ক্যাডারদের জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সামরিক শিক্ষণ কেন্দ্রে এদের কয়েকজনকে পাঠানো হল। লিপ্‌জিগে শিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয়দের প্রতি তেলেঙ্গানার অনুরূপ বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি প্রথম লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হই। লোকসভায় আমি রুশ-অনুপ্রেরিত কমিণ্টার্ণের ভারতে নাশকতামূলক কর্মতৎপরতার চক্রান্ত ফাঁস করে দিলাম। তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। রুশ কমিনফর্মের শাখা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যেরা আমার বিরুদ্ধে অধিকারগত প্রশ্ন উত্থাপন করে। আমি অবশ্য তাদের অভিযোগ ক্ষালন করি।

আমার বিবরণী কয়েকটা রুশ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়, অবশ্য বিকৃতি করে। যে-সব রুশদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তারা অবশ্য আমার স্ট্যালিন-বেরিয়া বিরোধী ভূমিকায় খুশী হয়েছেন। তখন থেকে যখনই আমি কয়েকবার পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট অধিকৃত এলাকায় ভ্রমণকালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছি, তাঁরা আমাকে এমন অনেক নতুন সংবাদ দিয়েছেন, যা বহির্বিশ্বে সম্পূর্ণ অজানা। নেতাজী-পন্থী ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দিগণ

রুশদের পক্ষে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার শিক্ষণ গ্রহণে বা ভারতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেলে সোভিয়েট গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দানে অসম্মত হন। তাঁদের ওপর রুশ গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী যে নির্যাতন চালিয়েছে, তার কাহিনীও এ-সব সংবাদের মধ্যে পেয়েছি।

(৩)

১৯৫৪ সালের শরৎকালে আমার প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য নরেন্দ্র দেবকে পূর্ব বার্লিন দেখিয়ে নিয়ে আসি। তখন স্ট্যালিন এবং বেরিয়ার যুগ অস্ত গিয়েছে। আমার রুশ বন্ধুরাও স্বস্তি পেয়েছেন।

আঁতের দঁ্য লিঁদেতে সোভিয়েট সাংস্কৃতিক ভবন ঘুরে দেখেছি। এমন সময় আমার পুরনো বন্ধু বোরিসের দেখা পেলাম। ১৯৩৪ সালে আমি যখন রাশিয়াতে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করি, তখন থেকে বোরিস আমার বন্ধু। আমরা দুজনেই বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অবনী মুখার্জি প্রমুখ মহান ভারতীয় বিপ্লবীদের গুণমুগ্ধ শিষ্য। লেনিনগ্রাডে তাঁদের সঙ্গে আমরা দুজনে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতাম। চট্টার নিকটে যাদুঘর পরিচালনার শিক্ষণ গ্রহণ করেছে বোরিস। বার্লিনে সোভিয়েট সাংস্কৃতিক ভবনে তাঁর আসার কারণ হল মস্কোর ট্রেট্রায়াকভ গ্যালারীর কয়েকটি রঙীন চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা। তাঁর ওয়াটসন ফ্লাটে সন্ধ্যার সময় গাল-গল্প করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালো, বললে—"সেখানে তুমি গোগার দেখা পেতে পারো।"

"কী?" আমি সচকিত প্রশ্ন করলাম। অবনী মুখার্জির রুশ সহধর্মিণী ফিটিংগফের পুত্র গোগা। তাঁদের একটি কন্যা ছিল, নাম মায়া। তার খবর চাইলাম। "তার খবর তো পাবেই। সঙ্গে পাবে এমন সব ভারতীয়দের খবর যারা রুশ মাটিতে বাস করছে এমন চিন্তা কোনদিন তোমার মাথায় আসেনি।

বোরিসের ফ্লাটে পৌঁছে দেখলাম প্রায় জন ছয়েক অতিথি এসেছেন। টেবিলের ওপর রুশ "সামোভার" প্রচুর "ঝাকুস্‌কি" এবং কয়েকটা খাঁটি রাশিয়ান ভড্‌কার বোতল সাজানো রয়েছে। ভারতীয়জাত রুশ গোগা ছাড়া সকলেই খাঁটি রুশ। তারা প্রাক্তন কমিণ্টার্ণের নবকলেবর কমিনফর্মের কর্মী।

দ্বারপ্রান্তে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে গোগা প্রশ্ন করল —"বাবা যে কাজের ভার আপনাকে দিয়েছিলেন, তা কি করে আপনি ভুলে গেলেন ?"

অবনীবাবুর প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম আমার মানস নয়নে। প্রাক্ যুদ্ধকালের একটি বছর। মস্কোতে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করি, তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছিল। কাতর অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন—"ভারতে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরো।"

যতদিন পর্যন্ত ভারত বৃটিশ শাসনে ছিল ততদিন রাশিয়াতে যেসব ভারতীয় বিপ্লবী একবার আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু সেই একই পরিস্থিতি স্বাধীনতা-উত্তর-কালেও দেখা যায়। সময়ে সময়ে যখনই এই প্রশ্ন লোকসভায় উঠেছে, শোনা গেছে মন্ত্রীদের কণ্ঠে ভাবপ্রবণ আশ্বাসবাণী। আমাদের বিপ্লবী নেতাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নে দেখা গেছে বৃটিশ আমলের সেই একই খেল। প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়েছে।

খুব লজ্জিতভাবে অবনীবাবুর খবর জানতে চাইলাম। প্রত্যুত্তরে গোগা আমাকে চমকিত করল। বললে—"জ্ঞানের জগতের লোক বলে বাবা স্ট্যালিনের শুদ্ধীকরণের বলি হননি। যুদ্ধের সময়ে সাইবেরিয়ায় কমিণ্টার্ণের নির্বাসিত বিদেশী হোমরাচোমরাদের মস্কো প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় পঞ্চাশের দশকে। তাঁদের কাছ থেকে বাবা শুনলেন যে, সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্‌ক্ বান্দশালায়

তাঁরা একজন অতি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতাকে দেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যুদ্ধের সময় আমাদের শত্রু জার্মান ও জাপানীদের সাহায্য করেছেন। বাবার বুঝতে দেরি হল না। তিনি আর কেউ নন। তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু। বন্দিশালা থেকে সুভাষবাবুর মুক্তি প্রার্থনা করে বাবা স্ট্যালিনকে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন।

বোরিস কথার মাঝখানে মন্তব্য করল—"এইজন্যেই বোধ হয় স্ট্যালিন তোমার বাবার ওপর খুব চটে যান।"

"ঠিক তাই। বাবা স্ট্যালিনকে লিখেছিলেন যে, সুভাষবাবু একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাঁকে জার্মান বা জাপানীদের ক্রীড়নক বলা সঙ্গত হবে না। বার্লিন এবং টোকিওতে তাঁর তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বহিঃশক্তির সাহায্য লাভ করা। আর সে সাহায্য তাঁর কাম্য ছিল একমাত্র রাশিয়ার নিকট থেকে। সুভাষবাবুর ওপর সুবিচার করার জন্য তিনি স্ট্যালিনকে অনুরোধ জানান। বাবার কাছ থেকে এমন অনুরোধকে স্ট্যালিন ফ্যাসিবাদী যুক্তি হিসেবে গণ্য করলেন। পত্রটি পাঠানোর পরের দিনেই রুশ গোয়েন্দা পুলিশরা বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আজও তিনি ফেরেননি।"

"দুঃখের বিষয়," বোরিস বলল—"সুভাষবাবুর পক্ষে প্রফেসর মুখার্জি বলেছিলেন আর তাই তাঁকেও ইয়াকুটস্ক্ বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়েছে।"

"তুমি নিশ্চিত জানো যে, সুভাষবাবু ইয়াকুটস্ক্ বন্দিশিবিরে আছেন?" আমি গোগাকে প্রশ্ন করলাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সমসাময়িক কমিণ্টার্ণের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ মাঝুত খুড়োকেও ট্রটস্কীপন্থী বলে ইয়াকুটস্ক্ পাঠানো হয়েছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি ফিরে এসেছেন। তিনিও বলেন যে—ইয়াকুটস্ক্-এর কেন্দ্রীয় বন্দিশিবিরে ৪৫ নম্বর সেলে সুভাষবাবুকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর আমার বাবা আছেন ৫৭ নম্বরে।"

"মাঝুত কি করে সুনিশ্চিত হলেন যে, তিনিই সুভাষবাবু ?"

"কেন ? আপনি জানেন, যুদ্ধের আগে বহুবার মাঝুত ভারতে গিয়েছেন। প্রায়ই তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন। এমন কি ডক শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।"

"মাঝুত কোন্ সালে সুভাষবাবুকে ইয়াকুটস্‌ক্ কারাগারে দেখেছেন ?"

"১৯৫০-৫১ সালে।"

"এরপর তাঁর সম্পর্কে আর কোন খবর তোমার জানা আছে ?"

"না।"

"স্ট্যালিনের মৃত্যু এবং বেরিয়াকে গুলি করে হত্যার পরে মাত্র আমরা আশা পোষণ করছি যে, বাবা ফিরে আসবেন। তিনি ফিরে এলে নিশ্চয়ই সুভাষবাবু সম্পর্কে তাজা খবর দিতে পারবেন।"

সোভিয়েট এলাকায় আমাদের পার্টি শেষ হতে ভোর হল। ফ্রেডরিখস্ট্যাসে এস্‌ভন্ স্টেশনে এলাম বোরিসের গাড়িতে। সেখান থেকে ট্রেনে যাত্রা করলাম পশ্চিম বার্লিনের হোটেলের উদ্দেশ্যে। সেখানে আচার্য নরেন্দ্র দেবজীকে রেখে এসেছি। গোগার সঙ্গে সুভাষবাবুর প্রসঙ্গে আলোচনার কথা যখন তাঁকে জানালাম, দেখলাম তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করে গোগার সঙ্গে অভাবনীয় সাক্ষাৎকার এবং নেতাজী সম্পর্কে তার কাহিনী জানিয়ে জওহরলালজীকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি দিলাম।

জওহরলালজীর নিকট থেকে এ সম্পর্কে কোন উত্তর না পেয়ে বুঝলাম যে, তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চান না। এবং নেতাজী প্রশ্নের পুনঃ অবতারণা করা তাঁর পছন্দ নয়।

অন্তরে আমি অনুসন্ধিৎসু থেকে গেলাম। পরের বছর ১৯৫৫ সালে বার্লিন থেকে বিমানে মস্কোতে গিয়ে নেতাজী প্রসঙ্গে খোঁজ খবর নেবার সুযোগ জুটে গেল।

॥ ১৫ ॥

নেতাজীর সামরিক নেতৃত্ব

(১)

ভারতের যুদ্ধ-ধ্বনি "জয় হিন্দ" নেতাজীর অবদান। ইতিপূর্বে বৃটিশ প্রভুত্বকালে ভারতের কোন যুদ্ধ-ধ্বনি ছিল না। রণাঙ্গনে মাতৃভূমির জন্য সর্বাত্মক ত্যাগের আদর্শে দেশবাসীকে তিনিই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতীয় সৈনিকের জীবনও এই মহান লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়।

প্রমাণ হল যে বৃটিশদের ওপর থেকে ভারতীয় দাসসুলভ প্রভুভক্তির অবলুপ্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রত্যক্ষ আঘাত পেয়েছে। তাঁর এই সাফল্য অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটাই নেতাজীর সর্বোত্তম অবদান। ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সিঙ্গাপুরের এক জনসভায় নেতাজী ভাষণ দিচ্ছিলেন। ষাট হাজার মানুষের জনতার নিকট নেতাজী সেদিন বলেছিলেন—"আমার মত বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে ভারতের কোন জাতীয়তাবাদী নেতা দাবি করতে পারেন না।" তাঁর এই দাবির ষোল আনাই যুক্তিসম্মত।

কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের সময় তিনি আজাদ বাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন—"আমাকে অনুসরণ করুন···আমি আপনাদের বিজয়-গৌরব ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।"

তাঁর প্রতিভাময় নেতৃত্ব দিয়ে নেতাজী সামরিক ও অসামরিক সকল শ্রেণীর কর্মচারীর হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর পতাকাতলে পূর্ব এশিয়ার কুড়ি লাখ ভারতীয় অধিবাসী সমবেত হয়। "সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি" প্রয়োজন—এই ধ্বনি দিতে তিনি তাদের আহ্বান করেন। তিন হাজার সৈন্য এবং তিন কোটি সিঙ্গাপুর

ডলার (ভারতীয় টাকায় প্রায় পৌণে পাঁচ কোটি) সংগ্রহের লক্ষ্য ধার্য করেছিলেন নেতাজী। কিন্তু নির্দিষ্ট ধ্রুবতারা হল—"আমাদের সম্মুখে রয়েছে একটা ভয়াবহ যুদ্ধ। আমাদের শত্রু পরাক্রমশীল সুযোগ-সন্ধানী এবং দুর্ধর্ষ। ক্ষুধার যাতনা, তৃষ্ণা, অনশন—সব তুচ্ছ করে শত্রুর মোকাবিলায় আপনাদের শ্রান্তিহীনভাবে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে স্বাধীনতা আপনাদের দ্বারপ্রান্তে আসবে।"

মালয়ের ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে নেতাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—"দেশ যুদ্ধে লিপ্ত। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের ধন-সম্পদ আপনাদের পরিতৃপ্তির জন্য তাহলে আমি বলব এটা আপনাদের ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র। আপনাদের জীবন, আপনাদের সম্পদ এখন আপনাদের নয়। সব কিছুই ভারতের এবং একমাত্র ভারতের সেবার প্রয়োজনে। আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যদি অগ্রসর না হন তা হলে অবশ্যই মনে রাখবেন আমরা দাসত্ব বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ থাকব না।...দেশের কাজে যারা আমাদের সাহায্য করতে নারাজ তারা আমাদের শত্রু।"

(২)

জওহরলালের নেতৃত্বকালে হিমালয়ের যুদ্ধে আমরা তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সত্য প্রকটিত হয়েছে যে পনের বছর দেশ স্বাধীন হবার পরেও প্রতি বছরে সৈন্যবাহিনীর বাজেটে কয়েক শত কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সৈনিকদের সমরসজ্জা শোচনীয়ভাবে অপ্রতুল। যুদ্ধের শুরুতেই সরকার পৃষ্ঠপোষিত সংস্থা গড়ে তোলা হল রণাঙ্গনে যুদ্ধরত জওয়ানদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, জুতা এবং মোজা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। এমন দৃষ্টান্ত অশ্রুতপূর্ব এবং চক্ষুর পীড়াদায়ক। যে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দৈনন্দিন প্রয়োজন

মেটাবার জন্য ভিক্ষার আশ্রয় নিতে হয় তাদের মনোবলের দুটি সর্বোচ্চ স্তম্ভ—আত্মমর্যাদা এবং শৌর্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

নেহরুজীর মৃত্যুর পর একটা বছর কেটে গেল। কম্যুনিস্ট চীন ও পাকিস্তানের সম্মিলিত আগ্রাসী থাবা আমাদের দেশের ওপর উদ্যত। কিন্তু নেতাজীর অনুরূপ আদর্শ সামরিক নেতৃত্বের অভাব আজও শোচনীয়ভাবে বর্তমান।

দেশের স্বাধীনতা এবং গণজীবন যখন এমন পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত তখন ইম্ফল অভিযানের প্রাক্কালে নেতাজী পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন আমাদের কর্তব্য তা অনুসরণ করা। বলা উচিত—"যুদ্ধলিপ্ত দেশে ব্যক্তিগত সম্পদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জাতির সম্পদ ভারতের এবং একমাত্র ভারতের কল্যাণের জন্য।"

রণাঙ্গনে সাফল্যময় নেতৃত্বের দুটি প্রধান সামরিক অঙ্গ হল—সদ্য প্রস্তুতি এবং অতর্কিত আক্রমণের ক্ষমতা। ইম্ফল অভিযানের সময় নেতাজী এই দুটি সামরিক কৌশল অবলম্বন করতে কখনও ভোলেননি।

ইম্ফল রণাঙ্গনে অতর্কিতে শত্রু-শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নেতাজী কৌশলপূর্ণ সৈন্য বিন্যাসের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন মুহূর্তময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন তাঁর রেডিও কেন্দ্র থেকে তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বৃটিশ ইস্তাহার বলে এক ধারাবিবরণী প্রচার হল—"আজাদ হিন্দ বাহিনী কালাদাম অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। পালেতাওয়া, তিদ্দিম এবং তোংজাং এখন তাদের দখলে। পালাম এবং ফেটি হোয়াইটও শত্রুকবলিত। আমাদের সপ্তদশ পদাতিকবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে। ইম্ফল-শিলচর সড়ক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পরিস্থিতি ঘোরালো হলেও আশঙ্কার কারণ নেই।"

অন্যদিকে কম্যুনিস্ট চীন ভারতের মনোবল ক্ষুণ্ণ করার জন্য

তার সশস্ত্র বাহিনীর শৌর্য সম্পর্কে যে অতিরঞ্জিত কাহিনী বহির্বিশ্বে প্রচার করেছে, ভারত তার সবটুকু সত্য বলে মেনে নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লালচীন প্রচার করল যে, তিব্বত উপত্যকায় তার আট ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেও এ খবরের পুনরুল্লেখ করা হল। কিছুদিন পরে তাওয়াং বিভাগের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণের প্রাক্কালে কম্যুনিস্ট চীন ঘোষণা করে যে, এই আক্রমণে অংশ নেবার জন্য ভারত তিব্বত সীমান্তে তার পনের থেকে বিশ ডিভিসন সৈন্য অপেক্ষা করছে। তার পরের দিনেই জওহরলালের কণ্ঠে আমরা এই খবরের পূর্ণ উক্তি শুনি।

সমরনীতির যে কোন একনিষ্ঠ ছাত্র খুঁটিনাটি বিচার না করে একবাক্যে নেতাজীর দাবিকে ষোল আনা যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেবে। নেতাজী বলেছিলেন—"আমার মত বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে ভারতের কোন জাতীয়তাবাদী নেতা দাবি করতে পারেন না।"

আমাদের দেশের স্বাধীন গণজীবন ধ্বংস করার জন্য যে আগ্রাসী মতলব নিয়ে কম্যুনিস্ট চীন হিমালয়প্রান্তে থাবা উদ্যত করে রয়েছে তা প্রতিহত করতে হলে আমাদের বর্তমান নেতৃত্বকে নেতাজীর সমরনীতি অনুসরণ করা দরকার।

(৩)

যুক্তি হিসাবে মানতে হবে যে, সুভাষের নামে অপপ্রচারের পশ্চাতে ছিল বৃটিশের স্বার্থ। ১৯৪০ সালের ১২ই জানুয়ারী শ্রী কে. এম. মুন্সী লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুন্সীজী এই সাক্ষাৎকারের বিবরণী রেখেছেন।—

মুন্সী। কংগ্রেসকর্মীদের বর্তমান মনোভাব আমি জানি। আমি ভাবি গান্ধীজী এদের কতদিন সংযত রাখতে পারবেন? বর্তমানে তিনি অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে এদের রাশ টেনে রেখেছেন।

লিনলিথগো। বিলক্ষণ মানি। গান্ধীজীর প্রভাব অসীম। কিন্তু আপনি কি বাস্তবিকই মানেন যে, জওহরলালকে তাঁর মতের অনুগামী রাখতে সমর্থ হবেন?

মুন্সী। জওহরলাল একজন মহান আদর্শবান পুরুষ। গণমানসে তাই তিনি বরণীয়। কিন্তু অনুপ্রেরণা সংগঠন এবং কর্মপদ্ধতি সব কিছুরই নিয়ন্তা হলেন গান্ধীজী। জওহরলাল কখনই গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে যাবেন না।

লিনলিথগো। আমার মনে হয় আপনাদের পদত্যাগ করা সমীচীন হয়নি; সম্ভবত এর পিছনে এমন যুক্তি রয়েছে যা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মুন্সী। ঠিক তাই। মন্ত্রিসভায় থেকে আমরা আপনাদের তুঙ্গ-উদ্যম বিশেষ সাহায্য করতে পারতাম না। তবে কেন্দ্রের শাসন পরিচালনায় অংশ পেলে হয়তো আমরা দেশবাসীকে বলতে পারতাম যে আমাদের কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। নয়তো মন্ত্রিসভায় আমাদের থাকা দায় হয়ে উঠত। যেমন, সুভাষ তাহলে আমাদের কাজ চালানো দুঃসাধ্য করে দিত।

লিনলিথগো। সুভাষকে কি আপনি খুব প্রভাবশালী মনে করেন? আমার কিন্তু অন্য মত।

মুন্সী। ঠিক তা নয়। আমরা যদি গদীতে থাকতাম তাহলে সুভাষ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ নিত। আমার মনে হয় সব দিক থেকে পরিস্থিতি এখন অনুকূলে। আপনার করণীয় কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

লিনলিথগো। আশা করছি শীগগিরই হবে।

বৃটিশদের করণীয় কাজ খুবই তাড়াতাড়ি সারা হল। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সরকারের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই পাশবিক শক্তির প্রয়োগে বৃটিশদের ওপর

সুভাষের আপসবিরোধী মনোভাব যে কোন ভারতীয় নেতা অপেক্ষা দৃঢ় হয়ে ওঠে।

অচিরেই যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সুভাষ ইম্ফল প্রান্তে বৃটিশদের আক্রমণ করলেন। অভীষ্ট পথে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি নিজেকে যুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্বের উপযোগী করে নেন। বৃটিশদের সঙ্গে আপসরক্ষার নীতি অনুসরণ করেছেন অন্য নেতারা। তাই সুভাষের মত সমর-পরিচালনায় নেতৃত্বের সুযোগ তাঁদের আসেনি। চীনা কম্যুনিস্টরা যখন ভারতের ওপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিল তখনই ভারতের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে এই যোগ্যতার তীব্র অভাব দেখা দিল।

দূরদর্শী আত্মত্যাগী পুরুষ তিনি। রণাঙ্গনে সঙ্গীন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি তাঁর লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে অনন্যসাধারণ একাগ্রতা এবং প্রীতির পরশ দিয়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন। তাঁর অনুগামীরাও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উচ্চ মনোবল সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বাহিনীতে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের কর্তব্য নেতাজীর আদর্শ অনুসরণ করা। এর ফলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অফিসাররাও কম্যুনিস্ট চীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনাপতি-মণ্ডলী গঠনে সমর্থ হবেন। লক্ষ্যসাধনের জন্য রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রেরণা দিয়ে নেতাজীর মত আদেশ দিতে হবে—আমাকে অনুসরণ করুন। হিমালয়ের যুদ্ধজয়ে আমি আপনাদের পুরোগামী হব।

(৪)

ইম্ফলের যুদ্ধে নেতাজীর সাফল্য লাভ না হলেও বৃটেনের সম্মুখে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠল। বৃটিশরা উপলব্ধি করল যে ক্ষুণ্ণ আনুগত্য সম্পন্ন ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে বৃটিশ স্বার্থে আর

ভারতকে পদানত রাখা চলবে না। ভারতীয় বাহিনীর সর্বশেষ বৃটিশ -সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

"স্থায়ী অফিসারদের মধ্যে যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছেন তাঁদের কোন ক্ষমা নেই। তাঁদের একমাত্র যুক্তি থাকতে পারে যে, "ভারতীয় করণের" প্রস্তাবের সূচনা থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের বৃটিশ সরকার প্রস্তাবটিকে যথাযথ রূপায়ণ করতে পারেননি। একারণেই সুযোগমত বিদ্রোহ করার মনোভাব ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে দানা বাঁধে।"

"...কতকগুলি বৃটিশ নীত ভারতীয় বাহিনীর প্রগতিশীল ও প্রতিভাবান অফিসারদের অন্তরে জাতিবৈষম্যের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। যেমন—বিভিন্ন ইউনিটির মধ্যে ভারতীয় অফিসারদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা ; বেতন ও চাকুরী সর্তাবলীতে বৃটিশ অফিসারদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ ; এবং কতিপয় বৃটিশ অফিসার এবং তাঁদের স্ত্রীদের কুসংস্কার এবং আচরণের মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাব। প্রগতিশীল অফিসাররা সাধারণত জাতীয়তাবাদী। তাঁরা চাইলেন ভারত স্বাধীন হোক। হোয়াইট হল থেকে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা হবে ; এটা তাঁদের পছন্দ হল না।"

হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীর অভিযানে এইসব জাতীয়তাবাদী অফিসারগণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বিশেষ শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেসব বৃটিশ অফিসাররা তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশ বিভাগের পরে তাঁরা অনেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে তাঁদের অধীনস্থ বাহিনী পরিচালনায় স্বয়ম্ভর হতে হয়েছে। দেশ রক্ষার জন্য তাঁরা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মান এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নেতাজীর নেতৃত্বের মৌল নীতি অনুসরণ করেছেন। সর্বাগ্রে বিবেচ্য ছিল দেশের স্বার্থ। তাই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং প্রতি-আক্রমণের যোগ্যতা রক্ষার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর রেখেছেন। বৃটিশদের

অভিযোগ ছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় বাহিনীর শৃঙ্খলাজ্ঞান একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু হল সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রমাণ হয়েছে যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বয়ম্ভর। যখনই তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই নবপ্রেরণা উন্মেষের জন্য অবশ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য হল নেতাজীর।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আমরা দেখেছি যে ভারতকে আর বৃটিশ বাহিনীর মোকাবিলায় অগ্রসর হতে হবে না। বরং ১৯৬২ সালের শরতে চীনা কম্যুনিস্টদের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হলে বৃটিশরা আমাদের সাহায্যে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছে। তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃটেনের কাম্য এ নয় যে, আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা চীন বা অপর কোন বহিঃশত্রু দ্বারা বিপন্ন হোক।

তাই আমরা সঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে বৃটিশদের নেতাজী-বিরোধী মনোভাব এখন বিস্মৃতির ইতিহাসে লুপ্ত অতীতের কাহিনী। বৃটিশ জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শৌর্য এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি অন্যতম। এমন মনোবৃত্তির পটভূমিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে বিশেষ করে যুদ্ধকালে নেতাজীর নেতৃত্বের প্রকৃত উদ্ঘাটনে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের দলিল দস্তাবেজ দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হিমালয় প্রান্তে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুদ্ধ বিজয়ে আমাদের রণধ্বনি হওয়া উচিত নেতাজীর 'জয় হিন্দ'।

॥ ১৬ ॥

মস্কোর সংবাদ

১৯৫৫ সালের গরমে মস্কোয় পৌঁছলাম। গত বছর বার্লিনে নেতাজীর সম্পর্কে গোগার কাহিনী মনে পড়ল। রাশিয়ার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, আগের দিনের মত বিদেশীদের গতিবিধির ওপর আর ততটা কড়া নজর রাখা হয় না। রুশ গোয়েন্দা চররা আমার পিছু নেয়নি দেখে আমি সোভিয়েট রাজধানীর প্রধান সড়ক গোর্কি স্ট্রীট ধরে হাজির হলাম পুশকিন্ প্রাসাদে।

যন্ত্রবৎ পরিচালিতের মত অগ্রসর হলাম স্ট্রাসৃনার বুলেভার্ডের দিকে। বেশ কয়েক বছর পর মস্কোয় প্রত্যাবর্তন করেছি। দেখলাম, ১৩ নম্বর বাড়িটার সব কিছু যেমনটি আগে ছিল আজও তাই রয়েছে। ফটকে প্রবেশ করে বাঁ দিকে গেলাম, গৃহরক্ষী জের্জুনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। রাশিয়ার গুপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্বাসী রক্ষী রাখা একটা সাধারণ ব্যাপার। আসলে এরা রুশ গোয়েন্দা বিভাগের অদৃশ্য চক্ষু। এদের কাজকর্মের ধার খুবই নিখুঁত।

সৌভাগ্যক্রমে, সাক্ষাৎ হল সেই ভাল মানুষ বুড়া পেট্রোভের সঙ্গে। কমিণ্টার্ণ পরিচালিত প্রাচ্যের কম্যুনিস্ট কর্মীদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমরেড জের্জুনী হিসেবে সে এখনও বর্তমান। ছাত্র-জীবনে রাশিয়া অবস্থান কালে তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। তখনকার দিনে মস্কোর বিদেশী ছাত্রদের রেশন ও হাত খরচের বরাদ্দ পরিমাণ ওপরতলার সরকারী কর্মচারীদের থেকে বেশী ছিল। মস্কোয় তখন খাদ্যাভাব চলছে। আমাদের জের্জুনীর খাদ্যের দিকে আমি নজর রাখতাম। তাই তার কৃতজ্ঞতা অর্জন করি।

পুরনো সুহৃদ হিসাবে দুজনে রসুইখানায় চলে গেলাম সামোভারের

চা পানের জন্য। সে আমার উদ্দেশ্য বুঝে নিল ইঙ্গিতে। পেট্রোভ স্বীকার করল—বললে—"আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার গোপন অনুসন্ধানের কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।"

গোগার কাহিনী বললাম তার কাছে। মন দিয়ে শুনে পেট্রোভ বলে উঠল—"ভেরা এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

"কোন্ ভেরা!"

"কেন, সেই কৃষ্ণনয়না ভেরা। আপনার কাছে বাংলায় কথা বলা শিখত।"

"এ ব্যাপারে সে কি করতে পারে?"

"স্ট্যালিনের সময় যে কমিণ্টার্ণের এশীয় গুপ্ত শাখার পরিচালিকা ছিল।"

"এখন সে কোথায়?"

"রাশিয়ার ইন্-ট্যুরিস্ট বিভাগের এশীয় ভ্রমণকারী শাখার কাজ দেখাশোনার ভার এখন তার ওপর।"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন।"

"কাল সন্ধ্যার বেশ খানিকটা পরে আপনি রসুইখানায় আসুন। নিরিবিলি তার সঙ্গে তখন কথা বলবেন।"

"আপনি নিশ্চিত যে আমি যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছি সে তার কিছু জানে?"

"বিলক্ষণ! ১৯৫০ সালের শুরুতে মাও সেতুং এখানে এসেছিলেন। তখন ভারত সম্পর্কে আলোচনার সময় ক্রেমলিনে তার ডাক পড়ে।"

"সোভিয়েট সরকারের ভারত সম্পর্কে সে দেখছি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে!"

"চীনা কম্যুনিস্টদের এক মিটিংয়ে আমার ডাক পড়েছিল একদিন। তাদের মস্কোয় আসার হেতু ছিল: আপনার সহপাঠী মঙ্গোলীয় ছাত্রদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া।"

পুরনো কমিণ্টার্ণ-মহলে ঘুরে বুঝলাম আমি ঠিক পথেই অগ্রসর

হয়েছি। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েট মহল উৎসুক। বিশেষ করে এই আগ্রহ আরও বেড়েছে জওহরলাল নেহরুর সরকারীভাবে রাশিয়া পরিদর্শনের পরে। কম্যুনিস্ট পার্টি-প্রধান ক্রুশ্চেভ সহ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর পাল্টা সৌজন্যমূলক ভারত পরিদর্শনের প্রস্তুতি পর্ব তখন শুরু হয়েছে।

"হিন্দী-রুশী ভাই ভাই" আবহাওয়ার সুযোগে সাহসভরে আমার ঈপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে চললাম।

(২)

পরিষ্কার বাংলায় ভেরা আমাকে বলল—"আকিমভ্‌কে আপনার মনে পড়ে না? লুবিয়াঙ্কায় আপনাকে সেই যে বদমায়েস লোকটা জেরা করেছিল। যুদ্ধের ক'বছর সে ভারতীয় সামরিক ইউনিটের অধ্যক্ষ হয়েছিল।"

"রুশ দেশে ভারতীয় সামরিক ইউনিট?"

"অবশ্য এ ইউনিটে কোন ভারতীয় ছিল না, সোভিয়েট জাতীয়দের এটা একটা গুপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উদ্দেশ্য, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদের অনুরূপ একটা ক্যাডার সৃষ্টি করা। প্রয়োজন বোধে এরা ভারত-সম্পর্কে কাজকর্ম চালাতে পারবে।"

"মতলব!"

"১৯৪০ সালের শেষে হিটলার-স্ট্যালিন গোপন মোলাকাতে সাব্যস্ত হয় যে, ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেবার পর ভারত রুশতাঁবে যাবে। তাই আমাদের ভারতীয় এলাকা শাসনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রশাসন যন্ত্র তৈরী রাখতে হয়েছিল। অবশ্য স্ট্যালিনের সঙ্গে হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ব্যবস্থা বানচাল হয়ে পড়ে।"

"এতে ভারত-সম্পর্কে কি হল?"

"নাৎসীদের রাশিয়া আক্রমণের পর হিটলার ভারতকে নিজের

তাঁবে রাখার আশা পোষণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের দালাল হিসেবে কাজ করার জন্য নাৎসীরা ফ্যাসীপন্থী ভারতীয় নেতা সুভাষ বসুকে গোপনে বার্লিনে আনার বন্দোবস্ত করে।"

"সুভাষ বসু কোন দিনই ফ্যাসীপন্থী ছিলেন না।" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"কিন্তু আকিমভের মত সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের তাই-ই ধারণা। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অনুচরদের দিয়ে সুভাষ বসু সম্পর্কে সে একরাশ রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে। লুবিয়াস্কার ভারতীয় ইউনিটের এক মিটিংয়ে আমি একদিন উপস্থিত ছিলাম। সেদিন আকিমভ্ বলে যে তিরিশের দশকের গোড়াতে ইউরোপ সফরের সময় বোস ফ্যাসিস্ট দলে যোগদান করেছেন।"

"এ খবর সম্পূর্ণ বাজে।"

"আকিমভ্ তার যুক্তির সমর্থনে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার বিবৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করেছে যে সুভাষ বসু ফ্যাসীপন্থী।"

"তাদের বিবৃতির অপব্যাখ্যা করেছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি।"

"ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বার্লিনে পৌঁছিয়ে সুভাষ বসু হিটলারের ফ্যাসীবাদী এশীয় মিত্রদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। আমাদের সোভিয়েট ভূমি আক্রমণের উদ্দেশ্যে চরম বিশ্বাসঘাতক জেনারেল ভ্লাসভের অনুগামীদের দিয়ে তার লোক-জনের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।"

"আপনি ভুল শুনেছেন। প্রাচ্য-যাত্রার সময় সুভাষ বসু তাঁর ইউরোপের ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান যে একমাত্র ভারত অথবা ভারত-প্রান্তের কোন রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে তারা মোকাবিলা করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথাই ওঠে না। বরং তাঁর অভিমত ছিল যে,

বৃটিশদের একমাত্র পরম শত্রু হল রাশিয়ানরা। সুতরাং তারা ভারতের মিত্র।"

"যাই হোক, সুভাষ বসুর কাযকলাপ সম্পর্কে আকিমভের ধারণা অন্যরকম। আমাদের চীনা কমরেডরা যখন দাইরেনে সুভাষ বসুর উপস্থিত সন্ধান দেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁকে জেরা করার জন্য আকিমভ্ মাঞ্চুরিয়ায় যান। আমাদের সকলের প্রত্যাশা মত আকিমভ্ তাঁকে জার্মান ফ্যাসীবাদীদের মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। বহু অনুগামীদের সঙ্গে তাঁকে ইয়াকুটস্কের কেন্দ্রীয় বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়।"

পেট্রোভ কথার মাঝে এসে আমাদের জানালো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর অধিবাসীরা এখন নৈশ-ভোজনের জন্য এখানে আসছেন। মসকোভা নদীর তীরে গোর্কী পার্কে পরের দিন ভেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব স্থির করলাম।

(৩)

ভেরার নিকট থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করলাম তাতে দেখা যায় যে, নেতাজী এবং তাঁর অনুগামীদের ইয়াকুটস্ক্ বন্দী শিবিরে সোভিয়েট গুপ্ত পুলিসের কড়া নজরে রাখা হয়। সাইবেরীয় বন্দী শিবিরগুলির দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বহির্বিশ্বে আন্দোলনের ফলে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে সাহিত্যিক ডস্টোজভ্স্কী জীবিত অবস্থায় বের হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভেরা আমাকে আশ্বস্ত করে বলল—"কমরেড ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে বিদেশী বন্দীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি ক্রমান্বয়ে উদার হচ্ছে। স্বদেশের সরকারের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে বেশ কয়েকজন বিদেশী বন্দীকে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

ভেরার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললাম—"আপনি কি মনে করেন যে আমাদের পক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলবে?"

"নয় কেন? এ কাজটা খুবই সহজ হত যদি জওহরলাল নেহরু যখন সরকারী ভাবে আমাদের দেশে কয়েক মাস আগে এসেছিলেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী স্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত স্তরে কোন বিষয়ে ফল পাওয়া যায় না। একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্তরে আলোচনার ফলেই বন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।"

মস্কো ত্যাগের পূর্বে ভেরার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের দূতাবাসে গেলাম। আমাদের দূতাবাসের দু' একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম কর্মচারী স্মিত হেসে আমাকে বললেন—"আপনি দেখছি কলকাতার "হেটো গুজবে" কান দিয়েছেন। এমন একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিয়ে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কে তিক্ততা আনার কোন মানে হয় না।"

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম—"এতে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবার আদৌ আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, বর্তমান সোভিয়েট শাসক গোষ্ঠী স্ট্যালিনের সময় যেসব অন্যায় করা হয়েছিল তার সংশোধনে তৎপর হয়েছেন। আমাদের ব্যাপারে স্ট্যালিন-হিটলার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দলিল প্রকাশের পর একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতের ওপর স্ট্যালিনের একটা লোভ ছিল। স্ট্যালিনই নেতাজীর ওপর অবিচার করেছেন। স্ট্যালিনবাদ অপসারণের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে নেতাজী প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বরং ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী আরও দৃঢ়তম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

আমার যুক্তি তার মধ্যে সায় দিল না দেখলাম। ঘটনাচক্রে দূতাবাসের প্রাঙ্গণে আমার সঙ্গে আমাদের মিলিটারী অ্যাটাশের সাক্ষাৎ হল। তাঁর ভাবটা কিছুটা যুক্তিবাদী, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর স্তরে বিষয়টি আলোচনা করে দেখবেন। তবে তিনি একথা

আমাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রসঙ্গটি একমাত্র আমাদের বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।

পরে যখন ভেরার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল সে বলল— "কেমন, আপনার নিজের দেশের যুদ্ধ-বন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা তুলে দূতাবাসের কাছ থেকে ধাক্কা খেলেন তো? আমিও ভেবেছিলাম যে ঠিক এইই ঘটবে।"

"আপনি কি করে শুনলেন?"

"পুরনো কামিণ্টার্ণের ভারতীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভারত-সোভিয়েট বিষয়ে আমাকে সব কিছু খবর রাখতে হয়। আর যদি আমি মনে করি যে আপনাদের দূতাবাসের মধ্যে কখন কি ঘটছে তার খবর রাখব. তাও অনায়াসে পারি।"

"কে আপনাকে এসব কথা বলে?"

"কেন? ভাল্‌ইয়ার আপনাদের দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ রক্ষা করে। সে আপনাদের কর্মচারী। আপনাদের দূতাবাসের ফটকের প্রবেশপথেই তার অফিস। ভাল্‌ইয়া আমার পুরনো সহকর্মী। আপনার অনুসন্ধানের ব্যাপারে আপনাদের দূতাবাসে কি আলোচনা হয়েছে সে তার সব কিছুই আমাকে বলেছে। তবে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যদি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কথা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছায় তাহলে আপনার আরও অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে। তাছাড়া আপনার সোভিয়েট বন্ধুদের আপনি বিপদের মুখে ফেলে দেবেন।"

তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে যে বইটি প্রকাশ করার স্থির করেছি তার কিছু উপাদান সংগ্রহের কাজে বেরিয়ে পড়লাম।

ভেরার সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্য এলাকা পরিদর্শনের সময়ে রুশ গোয়েন্দা পুলিসের অনুচররা আমার পিছু

নেয়নি। কিন্তু তার সুপারিশ সত্ত্বেও সাইবেরীয় অঞ্চল ভ্রমণের জন্য আমার ভিসার আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে।

তা হলেও আমি পর্যটকদের জন্য সদ্য দেওয়া সুযোগ সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করেছি। তাসখন্দ এবং আমু দরিয়ার ওপর তারমেজের পথে আফগান সীমান্তে পাড়ি দিলাম।

আমাদের মস্কো দূতাবাসের প্রশাসনযন্ত্রের বিরূপ মনোভাবের ফলে নেতাজী সন্ধানে আমার মস্কো মিশন ব্যর্থ হয়েছে। তবু আমার প্রত্যাশা মধ্য-এশিয়ায় আমার পুরনো কমিণ্টার্ণ সহযোগীদের সঙ্গে কিছুদিন যখন কাটাবো, সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সমর্থ হব।

॥ ১৭ ॥

মধ্য-এশিয়ার পথে

(১)

১৯৫৫ সালের রুশী অক্টোবর উৎসবের প্রাক্কাল পর্যন্ত আমাকে মস্কোয় থাকতে হল। ভেরা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—"একজন ঘোর ফ্যাসীবাদীর জন্য আপনার এবারের সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরটা মাটি করে ফেললেন। এখনও সময় আছে। আমি আপনাকে সাবধান হতে বলব। নয়তো, আপনাকে ইয়াকুটস্‌কে পাঠানো হবে, সুভাষ বসুর সঙ্গে বাস করার জন্যে।"

"তার চেয়ে আমার আনন্দের কিছু নেই।"

"মনে রাখবেন, জীবনে আর কোন দিন বাইরের জগতের মুখ দেখতে পাবেন না। এমন কি, আপনার কি ঘটল তাও আপনার দেশ জানতে পাবে না।"

"আপনারা এইভাবে আমাদের নির্যাতন করছেন অথচ ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী জাহির করে বেড়াচ্ছেন, এ কেমন ব্যবহার ?"

"কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নে ফ্যাসীবাদীদের সমর্থন করার মত ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছু নেই।"

"কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি যে, সুভাষ বসু ফ্যাসীবাদী নন।"

"আপনাদের এখানকার দূতাবাস আপনার সঙ্গে একমত নন।"

"আপনি কি করে জানলেন ?"

"আপনাকে কি বলিনি যে, আপনাদের দূতাবাস কোন বিষয় আমাদের কাছে গোপন রাখে না। বরং···আপনাদের দেশের অনেক জটিল প্রশ্ন সমাধানের ভার দেওয়া হয় আমার বান্ধবী কমরেড ভ্যালেনটিনা ভেরামোভার ওপর। সে আপনাদের দূতাবাসে চাকরি করে। কিন্তু আসলে মস্কোতে যে-কোন বৈদেশিক দূতাবাসে

আমাদের গোয়েন্দা পুলিসের যে সব অনুচর চাকরি করছে তাদের মধ্যে সে হল একজন অন্যতম অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত কর্মী। এখানে আপনার সন্দেহজনক গতিবিধির কারণ সম্পর্কে সে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা পুলিসকে জানিয়েছে। তার রিপোর্টে আপনাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা যায়। এখন রুশ কর্তৃপক্ষ আপনাকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগের ছাড়পত্র নাও দিতে পারেন।"

ভেরার কাছে গোপন রাখলাম যে, ইতিমধ্যে আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে সোভিয়েট পুলিসের কাছে রাশিয়া ত্যাগের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জানিয়েছি। অপ্রীতিকর আলোচনার পরিবেশ মুক্ত করার জন্য ভেরাকে বললাম—"আপনি আমার একজন পুরনো বান্ধবী। কমিণ্টার্ণের ভারত সম্পর্কে গুপ্ত শাখার দায়িত্বশীল সেক্রেটারী হিসাবে আমার কার্যকলাপ সব কিছুই মস্কোর যে কোন ব্যক্তির থেকে আপনি বেশী জানেন।"

"আপনি যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির চিরবিরোধী তা আমার জানা আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে সরকারী দূতাবাসের চেয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির রিপোর্টের দাম ঢের বেশী। আপনাদের দূতাবাসের কাগজপত্র থেকে আপনার সম্পর্কে যা জানব, তার চেয়ে আমাদের কাগজপত্রে আরও বেশী জানি। তাছাড়া তো রয়েছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির রিপোর্ট।"

"এসব রিপোর্টের মধ্যে মিল আছে কি ?"

"কমবেশী সমান। আপনাদের দূতাবাস আপনি ভারতীয় লোকসভার সদস্য তার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। ভ্যালেনটিনা তার সঙ্গে একটা নিজস্ব নোটে জানিয়েছে, আপনি পার্লামেণ্টে সোভিয়েট-বিরোধী বক্তৃতা দিয়েছেন।"

"পার্লামেণ্টে সোভিয়েট-বিরোধী কিছু বলেছি কি না, মনে পড়ে না।"

"ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকাগুলি থেকে আমরা সংবাদ

সংগ্রহ করে থাকি। তারা আপনাকে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হিসাবে মার্কা করেছে। সুভাষ বোসের মত একজন নামকরা ফ্যাসীবাদীর খোঁজখবরে আপনার এত সহানুভূতিশীল আগ্রহ দেখে মনে হয় আপনার সম্পর্কে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অভিযোগগুলি সত্য। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, সাইবেরিয়া থেকে সুভাষ বোসের মুক্তির প্রচেষ্টার বদলে আপনাকেই মেরু প্রদেশের অন্ধকার কারাগারে ঢুকতে হতে পারে।"

"এ পরিস্থিতিতে করণীয় কী পরামর্শ দিন।"

"সিধে ঘরে ফিরে যান। ইন্‌-ট্যুরিস্ট শাখার অধ্যক্ষ হিসাবে আমি আপনাকে রাশিয়া ত্যাগের একটা ছাড়পত্র দেব। আজ রাত্রে তাসখণ্ডে যে বিমান যাচ্ছে তাতে আপনাকে যেতে হবে। সেখান থেকে তার্‌মেজের পথে কাবুলগামী আর একটা বিমান আপনি পাবেন। কমিণ্টার্ণ দিনের আমার প্রিয় বন্ধু 'ভসা'কে এভাবেই আমি সাহায্য করতে পারি।"

আমাদের মস্কো দূতাবাসের অদ্ভুত কর্মধারার জন্য এভাবেই আমার নেতাজী-সন্ধানে রাশিয়া পরিদর্শন ব্যর্থ হয়ে গেল। সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হল যে, নেতাজী প্রশ্নে বা সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত যে কোন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আমাদের মস্কো দূতাবাসের ওপর আস্থা রাখা যায় না।

(২)

মস্কোর ভনুকোভো বিমানক্ষেত্র থেকে রাত তিনটায় আমাদের নিয়ে ইলিউশিন-১২ বিমানখানি আকাশে উঠল। উরালস্‌কে কিছু সময়ের জন্য অবতরণ করার পর আমরা কাজাকিস্‌তানের আক্‌ত্যুবিনস্‌ক বিমানক্ষেত্রে পৌঁছলাম। ভেরা আস্‌রাকোফ্‌কে ইতিমধ্যে তার করেছিল বিমানক্ষেত্রে আমার জন্য অপেক্ষা করতে।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝিতে মস্কোর কমিণ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আমার সহপাঠী ছিল। মধ্য-এশিয়ার ইন্-ট্যুরিস্ট বিভাগের এখন সে একজন কর্মচারী। আক্ত্যুবিন্সক বিমানক্ষেত্রে সে আমার সঙ্গে দেখা করল। সোভিয়েট এলাকা না ছাড়া পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে ছিল।

কাজাখ্ বিমানক্ষেত্রের তাপমাত্রা তখন শূন্যাঙ্কের বহু নীচে। সাইবেরিয়ার হিমবাহে আমাদের অনুভূতিশক্তি লোপ হবার উপক্রম। অনুযোগের সুরে বললাম—"এখানে মানুষ বাঁচতে পারে?"

আসরাকোফ্ মৃদু হেসে বললেন—"কল্পনা করুন তাহলে ইয়াকুটস্কের বন্দী-জীবন! ডস্টোভস্কীর কথায় ইয়াকুটস্কের বন্দী-শিবির হল সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতীক 'যমালয়'। তবু তিনি সাইবেরিয়ার সুদূর প্রান্তে নির্বাসিত হননি।"

"এই 'যমালয়' থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"আমাদের রাজনীতির গতি নতুন পথ ধরেছে। সম্ভবত আমাদের স্বার্থে এখন এই প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার।"

"যথা?"

"এটা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মধ্য-এশিয়ার যে অঞ্চলটা উন্নত হয়েছে সেদিকেই চীনের লোলুপ দৃষ্টি। যে-কোন সময়ে চীনের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হতে পারে। এদিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এশিয়ায় আমাদের অধিকার রক্ষা করতে হলে ভারতের সমর্থন চাই।"

"আপনারা যদি আমাদের যুদ্ধবন্দীদের, বিশেষ করে সুভাষবাবুকে মুক্তি দেন তাহলে নিশ্চয়ই ভারত রাশিয়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।"

"আমারও কামনা তাই। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মধারায় উভয় দেশের বহুজনের সমর্থন রয়েছে।"

"দেখুন," আসরাকোফ্ বলে চললেন—"বিশাল মরীচিকা মহাসমুদ্রে আমু দরিয়া কোথায় আত্মগোপন করেছে, তা আবিষ্কার করা খুবই সহজ। কিন্তু বিস্তীর্ণ সোভিয়েট দেশে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের হদিশ পাওয়া সুকঠিন।"

"যেভাবেই হোক, আমাদের এই অসাধ্য কাজ সাধন করতে হবে।"

"অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে বাধা সম্পর্কে আমি খুব বেশী চিন্তিত নই। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক, আমার তা-ই কামনা। কারণ আমার অনেক ভারতীয় বন্ধু অকারণে সাইবেরিয়ার বন্দী-শিবিরে নির্যাতিত হচ্ছেন। তাঁরা যে নিরপরাধ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা অভিযুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু সত্যই তাঁরা কোনদিন ফ্যাসীবাদী ছিলেন না।"

তাসখন্দে আমাকে তিন দিন কাটাতে হল। কারণ কাবুলের পথে সপ্তাহে একদিন বিমান যায়। নেতাজী সম্পর্কে আসরাকোফ্ অনেক কিছু বললেন। ব্যক্তিগত সহানুভূতি জানিয়ে আসরাকোফ্ বললেন—"আপনাদের মহান নেতার দশায় আমি দুঃখিত। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ একবার পেয়েছিলাম।"

"কবে?"

"১৯৪১-এর মাচে তাঁর বার্লিন যাবার পথে। কমিণ্টার্ণের নির্দেশে আমাদের আফগান সীমান্তের প্রান্ত থেকে মস্কো পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করি।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। তাঁর রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আফগানিস্থানের পথে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাকে তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন। হিন্দুকুশের সৌন্দর্য এবং ক্লেশকর অভিজ্ঞতার বিচিত্র বর্ণনা বহু পর্যটকের কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু অনন্যসাধারণ

অভিজ্ঞতার বর্ণনা একমাত্র সুভাষের কাছেই শুনেছি। বাহমিয়ায়, জগতের সেই ছুটি বৃহত্তম বুদ্ধমূর্তি তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাকে তীর্থ-যাত্রায় রূপায়িত করে। কাবুলের বরফ-পড়া শীতে তিনি অসুস্থ হন। কিন্তু মেঘমালায় আবৃত কোহ্-ই-বাবা গিরিপথ তিনি পার হলেন সপ্তম শতকের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর মত 'ধর্ম' অনুপ্রেরণায়।"

"আপনি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তখন কি তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন?"

"এমন কিছু নয়। আমু দরিয়া ফেরী নৌকা থেকে তারমেজে অবতরণ করে তাঁর জার্মান সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করেন স্থানীয় ইতিহাস সে জানে কি না। তার কাছ থেকে নেতিবাচক উত্তর পেয়ে সুভাষবাবু বলেন—'বহু অসমসাহসিক পর্যটক ও দুর্মদ অভিযাত্রী তাদের বিজয় অভিযানের সময় এই আমু দরিয়া পার হয়ে বিশ্বইতিহাসের গতি প্রভাবান্বিত করেছে'।"

"আমাদের কাছে সুভাষ বসুর তারমেজ অতিক্রম করাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার।"

"ঠিক বলেছেন।" মাথা নেড়ে আসরাকোফ্ বললেন—"এখনও আমার মনে পড়ে তাঁর জার্মান সঙ্গী আমার কাছে তাঁকে রেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্য জায়গায় গেলে সুভাষবাবু ফ্যাসীবাদীদের নিন্দাই করেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মস্কোয় পৌঁছিয়ে আমাদের সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেতে পারবেন কি না। কিন্তু স্ট্যালিনের যুগে সুভাষবাবুর মত একজন নেতার সঙ্গে নিজে হতে দেখা করার মত রাশিয়ায় কারও হিম্মত ছিল না। ফলে তাসখন্দ থেকে রেলপথে মস্কোর পৌঁছিয়ে সেই দিনেই তাঁকে বার্লিনের বিমান ধরতে হল।"

"অদৃষ্টের পরিহাস।"

"আমার ধারণা যে, সুভাষ যদি স্ট্যালিনের সাক্ষাৎ পেয়ে

আলোচনার সুযোগ পেতেন তাহলে ভারত থেকে বৃটিশদের তাড়াবার জন্য জার্মান অথবা জাপানীদের চেয়ে আরও আগে সোভিয়েট সামরিক সাহায্য পেতেন।”

“সম্ভবত তাই।”

“যাই হোক মস্কো রেল-স্টেশনে আমার যেসব কমিণ্টার্ণ বন্ধু সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁদেরও ধারণা তাই যে, তিনি খুব খুশী মনে বার্লিনের বিমানে চড়েননি। তাঁর পক্ষে অবশ্য দ্বিতীয় পন্থা ছিল না।”

আমার তাসখন্দ ছাড়ার সময় আসরাকোফ্ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, নেতাজী সম্পর্কে ইয়াকুটস্কের আর কোনও সংবাদ পেলে আমাকে জানাবেন। বিনা সরকারী সাহায্য বা তাদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের উদ্দেশ্য-পথে এগিয়ে চলার একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম স্থির করলাম।

তারমেজে কিছুক্ষণের জন্য আমরা থামলাম। একটা স্টাফ-কারে শহর ঘুরে দেখে আমু দরিয়ার ফেরী-ঘাটে পেঁৗছলাম। নদীর অপর তীরে আফগানিস্থান। এখান থেকে ঐতিহাসিক মরুযাত্রী দলের পথ ভারতের দিকে গিয়েছে।

আমাদের ইলিউশিনে দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগল। আর এই পথ নেতাজী অতিক্রম করেছেন দশ দিনে কঠোর শ্রান্তির মধ্যে। সহসা বৈমানিক আমাকে সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন—“আজ পামির এবং কারাকোরাম তাদের অনুপম রূপ নিয়ে উঁকি দিচ্ছে। এখানেই ভারত এবং আমাদের সোভিয়েট দেশকে উত্যক্ত করছে লাল চীন।”

॥ ১৮ ॥

যবনিকা দূর অস্তু

(১)

"নৈরাশ্যের শ্রান্তি তুচ্ছ করে যাঁরা জাতির স্বাধীনতা রক্ষায় সদা অতন্দ্র ছিলেন তাঁদের কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে জগতের সুপ্ত আত্মার চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠবে। আবার তাঁরা গর্জে উঠবেন।" এই সাঙ্কেতিক কথার বিনিময় হত জনৈক হাঙ্গারীয়ান বিপ্লবী এবং আমার সোভিয়েট বন্ধুদের মধ্যে। ১৯৬৪ সালের বসন্তে এই সাঙ্কেতিক আহ্বান বার্লিনে আমার কাছে এল। এটা আসলে জনৈক সোভিয়েট লেখক বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের আমন্ত্রণ। উদ্দেশ্য, রাশিয়ার বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টায় কর্মতৎপরতা শুরু করার আহ্বান।

জার্মান বিমান নির্মাতা ডোরনিয়ার একটা নতুন ধরণের বিমান নির্মাণ করেছিলেন। সংক্ষেপে এর নাম স্টল্। অর্থাৎ এটি স্বল্পপরিসর ক্ষেত্র থেকে উড্ডয়ন এবং অবতরণের উপযোগী। ভারতের পথে এই বিমানের একটা পরীক্ষামূলক পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রচেষ্টার সমাধি হল আমাদের সরকারের আমলাতন্ত্রের ছক বাঁধা নিয়মের বেড়াজালে। অগত্যা আমাকে স্মরণ নিতে হল নিয়মিত যাত্রীবাহী বিমানপথের। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, আমার বিশেষ ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এই ব্যবস্থা অচল।

যাই হোক্, পূর্বনির্দিষ্ট সময়মত ইতালির কাপরিতে জনৈক সোভিয়েট লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতে সমর্থ হয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মস্কো যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগে বঞ্চিত হয়েছি। তাঁর নিজের দেশের গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি এখানেই আমার সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করেছিলেন।

কাপরির মেরিনা পিক্কোলার সেই গৃহটিতেই আমাদের সাক্ষাৎ হল। ছাত্রজীবনে এখানেই ম্যাক্সিম গোর্কির সাক্ষাৎ লাভ করি। জার্মানীতে হিটলার তখনও ক্ষমতাসীন হননি। যাঁর সঙ্গে, আমি এখানে দেখা করছি তিনিও মস্কোতে গোর্কির ছাত্র ছিলেন।

পেটিয়া প্রাণ খুলে কথা বলা শুরু করলেন। বললেন—"আপনি মাত্র কয়েক জনের জন্য উদ্বিগ্ন। কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর মানুষ হয়েও আমাদের কি হাল স্বচক্ষেই দেখছেন না? সোভিয়েট ইউনিয়নে খুব কম পরিবার আছে যাদের একজনও স্ট্যালিনের অপরাধের বলি হয়নি। আর তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু সুভাষ বসুর প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।"

"ভাল কথা, রাশিয়াতে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করার আগে আপনাকে বর্তমান রাশিয়াকে চিনতে হবে।"

"সে কি?"

"সোভিয়েট কাগজগুলো ফ্যাসীবাদ বা নাৎসী বন্দী-শিবিরের কাহিনী আজকাল কম লিখছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ। কেন জানেন? প্রথম মৃত্যু শিবিরগুলো চালু জার্মানরা করেনি। করেছিল সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। প্রথম মৃত্যু শিবির চালু হল ১৯২১ সালে মেরুপ্রদেশের আরঘানজেলস্কের কাছে খালমাগোরে। সে কারণেই আমাদের সংবাদপত্রগুলোর এই নীরবতা। নাৎসী শিবিরের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করে নিজেদের কীর্তির সমালোচনা বন্ধ করার জন্য এই প্রজ্ঞা। আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হল যে আপনাদের যুদ্ধবন্দীরা যদি স্বদেশে ফিরে গিয়ে সোভিয়েট বন্দী-জীবনের কাহিনী প্রকাশ করেন তাহলে নাৎসী শিবিরগুলোকে মনে হবে ঢের বেশী সভ্য।"

"নাৎসীদের চেয়ে সোভিয়েট শিবিরের বন্দী সংখ্যা কি বেশী?"

"সোভিয়েট শিবিরগুলোর অস্তিত্ব হল তিন যুগ। বন্দী সংখ্যা হবে প্রায় ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ। সত্য অবশেষে প্রকাশ

পাচ্ছে। শিবির-জীবন বর্ণনা করে প্রায় দশ হাজার উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং স্মারক রচনা সাহিত্য-সাময়িকীর সম্পাদকদের হাতে পৌঁছেছে। সরকারী সূত্রে পাওয়া এ খবর। এতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মহলের ঊর্ধ্বতন স্তরেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে একদিকে স্ট্যালিনবাদের নিন্দা করে প্রচার হচ্ছে যে এতে শুধু দেশের ক্ষতি হয়নি। বস্তুত স্ট্যালিনবাদ একটা অপরাধ। আবার অন্যদিকে একই সুরে ক্রুশ্চেভের নিন্দাও বাদ যাচ্ছে না।"

"এ পরিস্থিতি শুধু যে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট মহলের পছন্দসই নয়, তা না, এতে ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও ফ্যাসাদে পড়েছে। আমাদের মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথে এ পরিস্থিতি কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আমার সোভিয়েট সাহিত্যিক বন্ধুটির সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে আমি যদি মস্কোয় পুনরায় যাই তাতে কোন বিশেষ ফল পাব না। একটা নির্ভুল সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবার জন্যে আমাকে স্বদেশে ফিরে গিয়ে জনসাধারণের নিকটে সব বৃত্তান্ত উপস্থাপিত করতে হবে যাতে জনমতের বিবেচনায় আমাদের সরকার নেতাজীসহ অন্যান্য ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটি জাতির উচ্চ পর্যায়ের বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার দান করেন।

(২)

অন্যের কাছে অসার মনে হতে পারে কিন্তু আমার বিশ্বাস নেতাজী প্রশ্নের মূলে প্রবেশ করার পূর্বে সুলেমান পর্বতমালার পথঘাট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। পেশোয়ার ত্যাগের পর তাঁর দ্বিতীয়বার অচিন দেশের পথে যাত্রা শুরু হয়। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে নেতাজীকে কঠোর কায়িক ক্লেশের জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে।

পেশোয়ার থেকে রাত্রির অন্ধকারে উপজাতি এলাকার পথে নেতাজী বেরিয়ে পড়লেন। কাবুল নদীর তীরে পৌঁছানোর জন্য তাঁকে সুলেমান পর্বতমালার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তিনি

দ্বিতীয় রাত্রি অতিবাহিত করেন আড্ডা শেরিফের এক মসজিদে। চতুর্থ দিনে আফগানিস্থানের মধ্যে অনেক দূর পৌঁছে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন যে তিনি বৃটিশ গোয়েন্দাদের নাগালের বাইরে এসেছেন।

নেতাজী যে পথ দিয়ে গিয়েছেন আমি সেই পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদে ও আরামে বার কয়েক পার হয়েছি ডাকোটা বিমানে। তাঁর পথ পরিক্রমা খুঁজে ফোটো নিয়েছি। আমাদের বিমান পথের মানচিত্রে স্থানটি নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত পেশোয়ার কনট্রোল টাওয়ার আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, 'কাবুল নদী আর সিন্ধু নদীর এলাকায় যাবার চেষ্টা করো না। পরিণাম মারাত্মক হবে।'

আমাদের নীচে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল। ধূসর সুলেমান পর্বতমালা নগ্ন এবং ক্ষুধার্ত। বিস্মিত হলাম, নদীমাতৃকার দেশ বাংলার কোমল মাটিতে যাঁর জন্ম তিনি কি করে এত শক্তি এবং সাহসের আধার হলেন যার বলে তুষারকুজ্ঝটিকাপূর্ণ রাত্রি তিনি এই দুর্গম পাহাড়ে কাটিয়েছেন।

আমাদের নেভিগেটর জানালেন—"পেশোয়ার আর মাত্র দশ মিনিটের পথ।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—"নেতাজীর কত সময় লেগেছে এটুকু পাড়ি দিতে?"

"পামির হিন্দুকুশের ওপর দিয়ে যখন সবেগে হিমবাহী তুষারঝঞ্ঝা চলছিল তখন তাঁর একটানা পাঁচ রাত ধরে এই পথটুকু পাড়ি দিতে হয়েছে।"

"আচ্ছা তুলনা করে দেখা যাক, সুলেমানের এই পথটুকু পার হতে নেতাজীর কত কষ্ট হয়েছে আর অন্তরীক্ষ প্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চলে উত্তর সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্‌ক বন্দীশিবির থেকে একজন রাশিয়ান বন্দীর কি হাল হবে। প্রথমত, বৃটিশসিংহের কবল থেকে স্বল্প আয়াসে বাঁচা যায় কিন্তু রুশ-ভল্লুকের আঁচড় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া

কঠিন। কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে অন্তর্ধান দেওয়া এক কথা আর ইয়াকুটস্কের কেন্দ্রীয় বন্দীশিবিরের বিরাট উঁচু দেওয়ালের ওপর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে বাইরে আসা অন্য ব্যাপার। সাইবেরিয়া থেকে গঙ্গার প্রবাহ নিকট নয়। এমন কি মানাচত্রেও নয়। রুশ-হাতে যারা বন্দী তাদের পক্ষে অবশ্য এমন চিন্তা করাও অস্বাভাবিক। সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির থেকে অন্তর্ধান দিয়ে সভ্য বিদেশী মাটিতে কোন ব্যক্তি পা দিতে সমর্থ হয়েছে এমন নজীর ইতিহাসে মেলে না। রুশদের বাস্তব চিত্র একমাত্র যে হতভাগ্য মানুষ অদৃষ্টের ফেরে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন জীবন কাটিয়েছে তার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব।

নেতাজী-প্রশ্নে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াস করেছেন। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের মত জায়গা থেকে সস্তায় কেনা সোভিয়েট সচিত্র সাময়িকী পড়ে রুশ-জীবন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া আর প্রত্যক্ষ দর্শন, দুয়ের মধ্যে ব্যবধান অসীম।

(৩)

১৯৬৩-৬৪ সালের শীতে পামির, কারাকোরাম এবং কেদার বদরির শীর্ষের ওপর দিয়ে আমার মস্কো-দিল্লী ভ্রমণে অন্তরের দাবদাহ প্রশমিত হল। নতুন করে ফিরে পেলাম নেতাজী-রহস্যের মধ্যে আরও নিবিড়ভাবে প্রবেশ করার উদ্দীপনা।

মস্কোর শেরামাতেভো বিমানক্ষেত্র থেকে বিমানে চড়লাম মাঝ রাত্রে। মাথার মধ্যে তখন প্রবল উত্তেজনা। আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোয় সাহায্য করার জন্য বন্ধুরা ইয়াকুটস্ক থেকে নেতাজী প্রসঙ্গে আরও খবর পাঠিয়েছেন। বিমানের একটা কোণে গা হেলান দিতে তন্দ্রা এলো। স্বপ্নে দেখলাম আমি ইয়াকুটস্কে অবতরণ করেছি। অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের অন্তরাল থেকে সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম—"মা গঙ্গা! আমার জয় হিন্দ গ্রহণ কোরো।"

গঙ্গার স্রোতের কলতান কানে ভেসে এলো।

নেভিগ্যেটর নাড়া দিতে তন্দ্রা কেটে গেল। কক্‌পিটে তার পাশে বসলাম। তাকিয়ে রইলাম সামনের দিকে। চোখ ঝলসিয়ে উঠলো, দূরের সুষমা-মণ্ডিত তুষারাবৃত পর্বত শীর্ষের ওপর বিছানো ঘন রক্তিম ছটায়। বিমান আরও ওপরে উঠলো। দৃষ্টিপথে এলো আরও সুউচ্চ পর্বত শীর্ষ। পাদদেশে নীল হ্রদ এবং সবুজ চারণ ভূমি।

প্রশ্ন করলাম—"এখন আমরা কোথায় ?"

"পামিরের ওপরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে গিলগিট। তারপর গাঙ্গোত্রী।"

"এত কাছে !"

"এই তুষারশুভ্র পর্বতরাজি আজ রুশ-ভারত মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচনা করেছে।"

"আপনার বক্তব্য বুঝতে পারলাম না।"

"পামিরের ঘাঁটি থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে পিকিং কর্মতৎপর। গিলগিট ভারতের অংশ, আমরা ঘোষণা করেছি। এটা অবশ্যই যুক্তি-সঙ্গত। এই অঞ্চলের চীনা আগ্রাসী সেনাবাহিনীর সদর ঘাঁটি কাশগর। যুক্ত ভারত-রুশ রক্ষা প্রচেষ্টায় তাদের কাশগর ঘাঁটি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়।"

"আমাদের এমন নেতা একজন মাত্র আছেন যিনি চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর শক্তি চুরমার করে দেবার জন্য জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ।"

"তিনি কে ?"

"নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।"

"তিনি এখনই নেতৃত্ব গ্রহণ করছেন না কেন ?"

"আমরা খবর পেয়েছি তিনি আপনাদের ইয়াকুটস্‌কে বন্দী।"

"সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমরা তাঁকে স্বদেশে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।"

॥ সমাপ্ত ॥